বিবর্তন কি কেবলই একটি তত্ত্ব?

অনন্ত বিজয় দাশ

অনেক সময় বলতে শোনা যায় "'*প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জৈববিবর্তন' জীববিজ্ঞানের নিছক (mere) একটি 'তত্ত্ব' (থিওরি) মাত্র, এর কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই।*" বিজ্ঞানে কোনো তত্ত্বের 'বাস্তব ভিত্তি' বা ফ্যাক্ট আছে কি নেই, বুঝতে হলে প্রথমে বিজ্ঞানে তত্ত্ব কিভাবে গঠিত হয়, বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কাজ কি—সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে। প্রায়শ আমরা যেভাবে সাদামাটা অর্থে 'তত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহার করে থাকি (যেমন কারো ব্যক্তিগত ধারণা, অনুমান, বিশ্বাসকে বোঝাতে), বিজ্ঞানে কিন্তু মোটেও সেরকমভাবে হাল্কা মেজাজে 'তত্ত্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয় না। বিজ্ঞানে 'তত্ত্ব' শব্দটির অর্থ বেশ গভীর। অনেক সময় আমরা বলে থাকি, 'বাংলাদেশের অমুক অঞ্চলের মানুষগুলো বড় বাজে, হাড়কিপ্টে। তাদের সাথে সম্পর্ক করা ভালো না।' 'সাদাদের তুলনায় কালো মানুষেরা বেশি বদমেজাজি, রাগী, খিটখিটে হয়' কিংবা 'মেয়েদের তুলনায় ছেলেরা বেশি মেধাবী হয়।' উক্ত উদাহরণগুলির কোনোটিই পরীক্ষিত-প্রমাণিত কোনো বক্তব্য নয়; যেনতেন অনুমান, লোককথা, আর stereotype মানসিকতায় আচ্ছন্ন বক্তব্য। বিজ্ঞান মোটেও লোককথা, stereotype বক্তব্য, যেনতেন অনুমানকে 'থিওরি' বা 'তত্ত্ব' বলে গ্রহণ করে না। বিজ্ঞান গবেষণা-পরীক্ষণ-প্রমাণের উপর নির্ভরশীল। বিজ্ঞানের যে কোনো শাখায় গবেষণার প্রথম ধাপ হচ্ছে 'অনুকল্প' (hypothesis) গঠন। সেটা নতুন তত্ত্ব গঠনের জন্য হতে পারে অথবা পুরাতন তত্ত্বকে সময়ের পরিবর্তনে নতুন করে ঝাচাই করে নেয়ার জন্য হতে পারে। অনুকল্প গঠনের কিছু আবশ্যিক পূর্বশর্ত আছে। যেমন : 'অনুকল্পটি অবশ্যই বাস্তব অভিজ্ঞতাপুষ্ট ধারণা হতে হবে, সুনির্দিষ্ট হতে হবে, প্রতিষ্ঠিত তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, পর্যবেক্ষণ-পরীক্ষণ-বিশ্লেষণ-যাচাইযোগ্য, যুক্তিসঙ্গত ধারণার প্রকাশক হতে হবে, ইত্যাদি।' উক্ত পূর্বশর্তগুলি পূরণ করে অনুকল্প গঠিত হলে এরপর অনুকল্পের অন্তর্ভুক্ত ঘটনা বা বিষয়গুলিকে সন্দেহাতীতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়। সন্দেহাতীতভাবে উক্ত বিষয় বা ঘটনাগুলি বিভিন্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হলে তবেই অনুকল্পটি 'তত্ত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি পায়; নয়তো অনুকল্পটি খারিজ হয়ে যায়।

কেবল কিছু ঘটনা বা বিষয়কে জানা বা চিহ্নিত করার মাধ্যমে বিজ্ঞানে 'তত্ত্ব' গড়ে ওঠে না। যেমন পৃথিবীর সাথে চন্দ্রের দূরত্ব কত, সূর্যের দূরত্ব কত, পৃথিবীর বয়স কত, মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী প্রাণীর পার্থক্য কি কি ইত্যাদি। রসায়নবিজ্ঞানে *Atomic Theory* বলতে কেবল বুঝায় না যে শুধু এটম বা পরমাণুর অস্তিত্ব রয়েছে; বরং কেমন করে-কিভাবে পরমাণুগুলো একে-অপরের সাথে ক্রিয়াশীল হয়, কিভাবে পরমাণুগুলো একত্রে মিলে যৌগ গঠন করে, রাসায়নিকভাবে পরমাণুগুলোর আচরণ কেমন ইত্যাদি বিষয়গুলো এই থিওরির আলোচ্য বিষয়। তারমানে বিজ্ঞান স্পষ্টই বৈজ্ঞানিক প্রকৃতির (Nature of Science) সাথে সম্পর্কিত। বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি হচ্ছে মূলত বৈধ-প্রমাণের মানদণ্ড, অর্থবোধক গবেষণা নক্সা, সম্ভাবনার সুনির্দিষ্ট পরিমাণ নির্ণয়, গবেষণার জন্য গৃহীত অনুকল্পগুলোর পরীক্ষণ, উপযোগী তত্ত্ব গঠন ইত্যাদি—যা এই পার্থিব জগতের কোনো নির্দিষ্ট ফেনোমেনা বা ঘটনা সম্পর্কে যথার্থ, নির্ভরযোগ্য এবং অর্থবোধক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা করে।[১]

বিজ্ঞানে তত্ত্বের কাজ কি? বিষয়টি বোঝার জন্য আমরা উদাহরণ হিসেবে নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্বকে বিবেচনায় নিই। নিউটনের জন্মের অনেক আগে থেকে (খ্রিস্টপূর্ব চারশো অব্দে প্লেটোর যুগেও) মানুষের জানা ছিল কোনো বস্তু উপরের দিকে ছেড়ে দিলে তা আবার পৃথিবীতে ফিরে আসে। কিন্তু কেন এমনটা ঘটে, তা মানুষের জানা ছিল না। নিউটন জানালেন, 'ভর ভরকে আকর্ষণ করে'। তিনি আরো জানালেন, অভিকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী সবকিছুকে তার কেন্দ্রের দিকে টেনে ধরে। গাছ থেকে আম-জাম-কাঁঠাল-কলা পড়লে কোনো কিছুই আর শূন্যে ভেসে থাকে না, মাটিতে পড়ে যায়। উপরের দিকে ঢিল ছুঁড়লে তা মাটিতে নেমে আসে। নিউটনের এ অনুকল্পটি বিভিন্নভাবে-বিভিন্ন সময়ে প্রমাণিত হয়েছে; ফলে অনুকল্পটি ইতিমধ্যে বৈজ্ঞানিক মহলে 'তত্ত্ব' হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। নিউটনের এ তত্ত্ব দ্বারা আমরা পৃথিবীর একটি বাস্তবতা 'অভিকর্ষ বল'-এর অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করতে পারি। আবার জৈবযৌগ-অজৈবযৌগ হচ্ছে পৃথিবীর বাস্তবতা, সেই জৈবযৌগ-অজৈবযৌগের গঠন, রাসায়নিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ইত্যাদি আমরা ব্যাখ্যা করতে পারছি এটমিক থিওরি দ্বারা। অর্থাৎ বাস্তবতা হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন তথ্য (information) আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হচ্ছে, পৃথিবীর সেই তথ্যের ব্যাখ্যা।[২] আরেকটু পরিষ্কার করে বলা যায়, 'যে অনুকল্পটি সবচেয়ে ভালোভাবে বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে, সেই অনুকল্পকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হিসেবে গ্রহণ করা হয়।' কিছু বাস্তবতা আছে, আমরা সরাসরি উপস্থিত হয়ে চাক্ষুস অবলোকন করতে পারি না বা সম্ভবও না, যেমন পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহগুলি যেমন সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে সৌরজগতে ঘূর্ণায়মান রয়েছে; যা সরাসরি উপস্থিত থেকে চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয়। একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর পক্ষে সম্ভব নয় একটি নক্ষত্রকে কৃষ্ণগহ্বরে পরিণত হওয়া প্রত্যক্ষ করা। কিংবা একজন ভূতাত্ত্বিকের পক্ষে সম্ভব নয় পৃথিবীর কেন্দ্রের গঠন দেখে আসা। অর্থাৎ, পৃথিবীর সব বাস্তবতা এক রকম নয়; কোনোটা চাক্ষুস দেখা যায়, কোনোটা চাক্ষুস দেখা যায় না। বিজ্ঞানও তত্ত্ব গঠনের জন্য শুধুমাত্র গবেষণা পদ্ধতি 'সরাসরি উপস্থিত হয়ে বাস্তবতা প্রত্যক্ষণের' উপর নির্ভরশীল নয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায়

গবেষণার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কোথাও ডিডাকটিভ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়, কোথাও ইনডাকটিভ পদ্ধতি। আবার কোনো বিজ্ঞানী বা গবেষক মিথ্যা প্রতিপন্নকরণ যোগ্যতার (Falsifiability)-এর উপর গুরুত্ব প্রদান করেন, ইত্যাদি। কিন্তু বিজ্ঞানে কোথাও অপ্রমাণিত অনুমান বা অনুকল্পকে পরীক্ষণ-বিশ্লেষণ ব্যাতিরেকে মেনে নেওয়া হয় না, 'তত্ত্ব' হিসেবে গ্রহণ করা হয় না।

১৮০৮ সালে জন ডাল্টন *A New System of Chemical Philosophy* গ্রন্থে পরমাণুর গঠন নিয়ে প্রথম অনুকল্প প্রদান করেন, ১৮১১ সালে এভোগ্রেড্রো উক্ত অনুকল্পে কিছু সংশোধনী আনেন। ১৯০৪ সালে জে. জে. থমসন বলেন, পরমাণুর ভেতর ধনাত্মক আধানকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রন পরিভ্রমণরত। ১৯০৯ সালে আর্নেস্ট রাদারফোর্ড পরমাণুর নিউক্লিয়াস আবিষ্কার করেন এবং এর পরে নীল্‌স বোর ইলেকট্রনের ঘূর্ণনের গতিপথ সম্পর্কে ধারণা দেন। ১৯৩২ সালের দিকে জেমস চ্যাডউইক পরমাণুর ভর আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে এটমিক অনুকল্পটি প্রমাণিত হয় কিন্তু তখন পর্যন্ত কারও পক্ষে পরমাণুর গঠন 'চাক্ষুস' অবলোকন করা সম্ভব হয় নি। রাসায়নিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরমাণুর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিৎ হয়েছিলেন বলেই বিজ্ঞানীরা এটমিক থিওরি মেনে নিয়েছিলে। পরবর্তীতে ১৯৮১ সালে শক্তিশালী স্কেনিং ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর ছোট ছোট বলের মতন পরমাণুর অস্তিত্ব চাক্ষুস দেখা সম্ভব হয়েছে।

আমাদের এই চিরচেনা জগতের 'বাস্তবতা' কি কি? এককথায় ক্রম পরিবর্তনশীলতা; নিয়মিত পরিবর্তন এবং অনিয়মিত পরিবর্তন। নিয়মিত পরিবর্তনের উদাহরণ হচ্ছে, নিজ অক্ষে পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবীতে দিন-রাতের পরিবর্তন, জোয়ার-ভাঁটা, চন্দ্রগ্রহণের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠে জলের উচ্চতা বৃদ্ধি, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে ঋতুর পরিবর্তন, ইত্যাদি। অনিয়মিত পরিবর্তনের উদাহরণ হচ্ছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে টেকটনিক প্লেটগুলোর অবস্থান পরির্তন, মরুকরণ, ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরি থেকে নির্গত লাভার মাধ্যমে পরিবেশের পরিবর্তন, বরফ যুগের আবির্ভাব, ইত্যাদি। জীবজগতের বাস্তবতা হচ্ছে—সকল জীবের বংশবৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি, যেমন : 'আমাদের বাসা-বাড়িতে যে মাছি (*Musca domestica*) সাধারণত দেখা যায়, এর জীবনচক্র বা প্রজন্মকাল ২৩ দিনের। ছয়টি ব্যাচে মাছি ডিম পাড়ে। প্রতিটি ব্যাচে থাকে ১২০-১৫০টি ডিম। এই হিসেবে একটি স্ত্রীমাছির সব বংশধরেরা বেঁচে থেকে যদি নতুন বংশধর রেখে যেতে পারে, তবে এক বছরের মধ্যেই মোট মাছির সংখ্যা দাঁড়াবে ১৯১ × ১০^{১৮}। একটি ঝিনুক বছরে ১০০ মিলিয়ন ডিম ছাড়তে পারে। একটি স্ত্রী স্যামন মাছ বছরে ২৮ মিলিয়ন ডিম পাড়ে। অন্য জাতের কোনো কোনো মাছ অবশ্য অনেক কম ডিম ছাড়ে। তাও বছরে ১.৭ মিলিয়ন হতে পারে। প্রতিটি তারা মাছ (*Piaster oraceous*) এক বছরে ৫০ মিলিয়ন ডিম ছাড়ে। উল্লেখ্য তারা 'মাছ' বলে ডাকলেও এটি 'মাছ' নয়, অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এক ধরনের ব্যাঙ (Bull frog) বছরে ২০,০০০ ডিম পাড়ে। অন্যান্য ব্যাঙ কম করে হলেও বছরে এক হাজার ডিম পাড়ে। একটি অর্কিড গাছ থেকে বছরে এক মিলিয়ন বীজ উৎপন্ন হতে পারে। পৃথিবীতে যেসব জীবের প্রজনন হার অত্যন্ত কম, তার মধ্যে হাতি একটি। যদি সমস্ত প্রজন্মের সমস্ত হাতি সফলভাবে বংশরক্ষা করে যায়, তাহলে এক জোড়া হাতি থেকে ৭৫০ বছরে শুধু হাতির জনসংখ্যা হবে এক কোটি নব্বই লক্ষ।'[৩] কিন্তু প্রকৃতিতে বেঁচে থাকার জন্য জীবের খাদ্য, বাসস্থান, সঙ্গী, আনুসাঙ্গিক চাহিদা পূরণের অবলম্বনগুলোর বৃদ্ধির হার এতোটা নয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সকল জীবকে টিকে থাকার জন্য (মানে বেঁচে থাকার জন্য চাহিদা পূরণ করতে) নিজেদের অজান্তে জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়। জীবজগতের এই বাস্তবতা নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ নেই। ডারউইন জীবের জীবন রক্ষার সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়া কিংবা অত্যাধিক বংশবৃদ্ধির হার সীমাবদ্ধ থাকার জন্য কয়েকটি বিষয় চিহ্নিত করেছেন, যেমন খাদ্য সংকট, শত্রুর সাথে লড়াই, আবহাওয়া-ভূপ্রকৃতি-পরিবেশের ক্রমপরিবর্তন ইত্যাদি। প্রতিটি জীবের এ জীবন সংগ্রামকে তিনটি ধারায় পরিচালিত হতে দেখা যায় : প্রথম, আন্তঃপ্রজাতি মানে একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যেকার সংগ্রাম, দ্বিতীয়, একই ভৌগলিক এলাকায় বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেকার সংগ্রাম, এবং তৃতীয়, জীবন ধারণের জন্য প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম। অবশ্য ডারউইনের মতে তিন ধরনের সংগ্রামের মধ্যে সবচেয়ে তীব্রতর সংগ্রাম হচ্ছে একই প্রজাতির বিভিন্ন সদস্যের মধ্যেকার সংগ্রাম।

যৌন-প্রজননশীল জীবে মাইয়োসিস প্রক্রিয়ায় 'জনন কোষ' বিভাজনের সময় জিনের মিউটেশন (Mutation) বা ক্রোমসোম মিউটেশনের মাধ্যমে প্রকরণ (Variation)-এর উদ্ভব একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ প্রত্যেক প্রজাতির সদস্যরা সকলে দেখতে অবিকল এক রকম হয় না (অবিকল যমজ বাদে)। সামান্যতম হলেও তাদের মধ্যে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগত বিভিন্নতা থাকে। হতে পারে দৈহিক চেহারায় (ফর্সা, কালো, দাগযুক্ত, দাগ ছাড়া), আকৃতিতে (লম্বা, বেঁটে, মাঝারি) কিংবা অন্য কোনোভাবে। যেমন প্রজাপতির একই বংশধরদের মধ্যে কারো গায়ে ফুটকিযুক্ত দাগ বেশি, কারো কম, কেউবা ধূসর বর্ণের, কেউবা বেশি রঙিন, ইত্যাদি। টিকে থাকার জন্য সকল জীবই নিজেদের অজান্তে প্রতিযোগিতায় শামিল হয়, পরিবর্তিত পরিবেশে ঐসব ভ্যারিয়েশন বা প্রকরণগুলির কোনো কোনোটি যদি পরিবেশের সাথে অভিযোজন ঘটাতে সুবিধাজনক হয়ে দেখা দেয় তবে ঐ জীবেরা 'জীবন সংগ্রামে' টিকে যায়। অধিক হারে বংশধর রেখে যেতে পারে। কিন্তু যেসব জীবের প্রকরণগুলো পরিবেশের সাথে অনুকূল নয় (যেমন রঙের

ভ্যারিয়েশনের কারণে অনেক প্রাণী ক্যামোফ্লেজ করে শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে, আবার অনেকে উজ্জ্বল বর্ণের কারণে সহজেই শত্রুর হাতে ধরা পড়ে যায়), তারা জীবন-সংগ্রামে টিকে থাকতে পারে না, তাদের নির্বিশেষে বিলুপ্তি ঘটে। জীবের জীবন রক্ষার সংগ্রামে সফল হওয়ার অর্থ শুধু জীবের নিজের বেঁচে থাকাই যথেষ্ট নয়, সফলভাবে নিজের বংশধর টিকিয়ে রেখে বংশরক্ষা

WviDB‡bi c¯—weZ cvKwZK wbevPb g‡Wj*

d¨v± 1. প্রত্যেক প্রজাতির জীবের বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা এত বেশি যে উৎপন্ন সকল বংশধর বেঁচে থাকলে এবং পুনরায় সন্তান জন্ম দিলে ঐ প্রজাতির পপুলেশনের জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে গুণনীয়কের (exponentially) মানে। যদি না কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা থাকে। (উৎস : উইলিয়াম প্যালে, ম্যালথাস)।

d¨v± 2. বার্ষিক সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি ও মাঝে মাঝে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যতীত সময়ের সাপেক্ষে পপুলেশনের সদস্য সংখ্যা ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় থাকে। (উৎস : বৈশ্বিক পর্যবেক্ষণ)।

d¨v± 3. প্রত্যেক প্রজাতির জন্য খাদ্য-বাসস্থান-সঙ্গী ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ সীমিত। (উৎস : পর্যবেক্ষণ, ম্যালথাস সমর্থিত)।

Abwm×vš 1. তাই একটি প্রজাতির প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য তীব্র প্রতিযোগিতা বা অস্তিত্বের সংগ্রাম ক্রিয়াশীল থাকে। (উৎস : ম্যালথাস)।

d¨v± 4. যৌনজননের মাধ্যমে উৎপন্ন কোনো প্রজাতির পপুলেশনে কোনো দুটি জীব হুবহু একরকম হয় না। যে কোনো জীবের পপুলেশনে প্রচুর পরিমাণ ভ্যারিয়েশন লক্ষ্য করা যায়। (উৎস : পশু প্রজননকারী, শ্রেণীবিন্যাসবিদ)।

Abwm×vš 2. জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কোনো পপুলেশনে স্বতন্ত্র জীবের টিকে থাকা মোটেও র‍্যান্ডম বিষয় নয়। তা নির্ভর করে জীবের বংশধারার উপর। জীবের এই অস্তিত্বের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে টিকে থাকার আরেক নাম প্রাকৃতিক নির্বাচন। (উৎস : ডারউইন)।

d¨v± 5. পপুলেশনের প্রত্যেক স্বতন্ত্র জীবে যে ভ্যারিয়েশন রয়েছে তার অনেকাংশেই বংশানুসৃত। (উৎস : পশু প্রজননকারী)।

Abwm×vš 3. প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলমান থাকে। (উৎস : ডারউইন)।

* Ernst Mayr, *What Evolution is,* Orion Publishing Group, 2002, p. 128

করাটাও অত্যন্ত জরুরি।

একটি আম গাছে মুকুল ধরে হাজার-হাজার, সেই মুকুলের অনেকাংশ ঝরে পড়ে যায় ঝড়-বৃষ্টির কারণে। তারপর আবার পোকার আক্রমণের কারণে মুকুলের পরিমাণ আরো কমে যায়, যে সংখ্যক মুকুল থেকে আম ধরে, সেগুলিও ঝড়-বৃষ্টির কারণে বড় হবার আগেই ঝড়ে যায়, পোকার আক্রমণেও মরে যায় অনেকগুলো। আম গাছে যে পরিমাণ মুকুল ধরে, সে তুলনায় গাছে আম হয় অত্যন্ত নগণ্য পরিমাণ; এবং এই নগণ্য পরিমাণ আমের বীজ থেকে নতুন আমের চারা হয় আরো অনেক কম পরিমাণ। একটি মাছের পেটে যে পরিমাণ ডিম থাকে তার বেশিভাগই ডিম ছাড়ার পর শিকারী মাছের খাবারে পরিণত হয়, পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে অনেক ডিম উর্বর হতে পারে না, এমন কী স্রোতেও প্রচুর ডিম নষ্ট হয়ে যায়। যে পরিমাণ ডিম থেকেও মাছের পোনা হয় তারও একটা বড় অংশ আবার বড় মাছের খাদ্যের শিকার হয়, যে পোনাগুলি শেষমেশ বেঁচে থাকতে পারে শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে, তাদের মধ্যেও বড় হবার সাথে সাথে বেঁচে থাকার জন্য খাদ্যের সংস্থান করা, শত্রু মাছের নজর এড়িয়ে টিকে থাকা, সঙ্গী নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে জীবন সংগ্রাম চলতে থাকে। বলা যায়, জীবজগতের নিষ্ঠুর বাস্তবতা হচ্ছে বেঁচে থাকার প্রতিযোগিতা। জীবের বংশবৃদ্ধির অত্যাধিক প্রবণতার কারণে বিপুল সন্তান জন্ম দিলেও প্রত্যেকটি প্রজাতির জীবসংখ্যার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি ঘটে না। ডারউইন '*অরিজিন অব স্পিসিজ*' গ্রন্থে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' প্রক্রিয়ায় জীবজগতের এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করেছেন। জীববিজ্ঞানে আর এমন একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেই, যা জীবজগতের এ বাস্তবতাগুলোকে সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। জীবজগতে খাদ্যের জন্য, বাসস্থানের জন্য, সঙ্গী নির্ধারণের জন্য, বংশ রক্ষার জন্য, শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য কেউবা অতিরিক্ত সুবিধা পেয়ে থাকে প্রকরণ থেকে,

কেউবা পায় না। অতিরিক্ত সুবিধা পেলে ঐ প্রাণী কঠোর অস্তিত্বের সংগ্রামে উদ্বর্তিত হয়, নতুন বংশধর রেখে যেতে পারে। ডারউইন যাকে বলেছিলেন 'পরিবর্তনযুক্ত উত্তরাধিকার' (Descent with Modification)। দীর্ঘসময় ধরে প্রজন্মান্তরে এভাবে চলতে থাকলে একসময় 'পরিবর্তনযুক্ত উত্তরাধিকার' থেকে সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির উদ্ভব হয়। নতুন প্রজাতির উৎপত্তিসহ জীবের বেঁচে থাকা, বিলুপ্তি, সংগ্রাম ইত্যাদি সামগ্রিক প্রক্রিয়ার নাম 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' (Natural Selection)।

'চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ'—ছোটবেলায় আমরা সবাই এমনটাই আমরা পড়ে এসেছি। প্রাকৃতিক নির্বাচনের 'প্রকৃতি' বলতে তা-ই। আমাদের চারপাশের প্রাণীজগৎ-উদ্ভিদজগৎ, জড়জগৎ (চন্দ্র, সূর্য, আবহাওয়া, ঝড়-বৃষ্টি, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র, ভূমি ইত্যাদি) সবকিছুই প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। জীবজগৎ-জড়জগৎ একে অপরের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত। একে অপরের উপর নির্ভরশীল। সাধারণত 'নির্বাচন' বলতে বোঝায় কোনো কিছু বাছাইকরণ। ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' শুধু আমাদের জীবজগতের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তনশীল উপাদানের প্রভাবে জীবজগতে যে বাছাইকরণ ঘটে তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের কোনো চেতনা নেই, পূর্ব পরিকল্পনা নেই, নেই দূরদৃষ্টি। এটি কোনো জীবকে পরিবেশের সাপেক্ষে উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে সাহায্য করে না। জীবের বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যসমূহের (traits) উপর যদিও প্রাকৃতিক নির্বাচন সক্রিয় কিন্তু জীবের নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিবর্তিত হতে পারে। উদ্ভূত হতে পারে। মিউটেশনের মাধ্যমে ভ্যারিয়েশন ঘটে থাকে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া প্রতিটি ইন্ডিভিজুআল বা একক জীবের উপর ক্রিয়াশীল থাকলেও ফলাফল প্রকাশ পায় সম্মিলিতভাবে গোটা প্রজাতিতে বা পপুলেশনে। তাই বলা যায় প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যক্তিগত কোনো প্রক্রিয়া নয়; এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন মোটেও র‍্যান্ডম বা আকস্মিক, বিক্ষিপ্ত কিংবা দৈবক্রমে ঘটা কোনো ঘটনা নয়। এটি চূড়ান্ত (deterministic) প্রক্রিয়া। পরিবেশের জন্য উপযুক্ত ভ্যারিয়শনসম্পন্ন জীব অধিক হারে বংশধর রেখে যেতে পারে, আর অনুপযুক্ত ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন জীবের পরিবর্তিত পরিবেশে টিকে থাকা দায় হয়ে যায়, বিলুপ্তি ঘটতে থাকে ধীরে ধীরে। জীবজগতে 'নির্বাচন' ক্রিয়াশীল নন-র‍্যান্ডম, দৃঢ় ক্রমবর্ধমান (*cumulative*) পদ্ধতিতে। রোমান সভ্যতা যেমন একদিনে তৈরি হয় নি, উত্তর-দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের বরফ যেমন তাৎক্ষণিকভাবে উদ্ভূত হয় নি, তেমনি প্রাকৃতিক নির্বাচন-ও তাৎক্ষণিক কোনো ঘটনার ফল নয়, নয় ইতঃস্তত-বিক্ষিপ্তি চান্সের কোনো খেলা। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া কোনো 'কারণ' নয়, এটি জীবজগতে কয়েকটি ঘটনার সম্মিলিত ফলাফল বা পরিণতি। সংক্ষেপে কোনো প্রজাতিতে বা পপুলেশনে বংশানুসৃত প্রকরণের (variation) প্রভেদমূলক প্রজনন (differential reproduction) থাকে তবে ঐ প্রজাতিতে বা পপুলেশনে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিবর্তন ফলাফল হিসেবে প্রকাশিত হবে।[৩]

ডারউইন *অরিজিন অব স্পিসিজ* গ্রন্থে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'কে মানুষের বোধগম্য করার জন্য *কৃত্রিম নির্বাচন* বিষয়টি প্রচুর উদাহরণের সাথে উপস্থাপন করেছেন। কৃত্রিম নির্বাচন (artifical selection) হচ্ছে আমরা মানুষেরা সচেতন বা অসেচতনভাবে জীবজগতে যে নির্বাচন পরিচালনা করি, তাকে বোঝায়। পৃথিবীতে কৃষির ইতিহাস মোটামুটি বেশ প্রাচীন। আধুনিক মানুষের উদ্ভব প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে ধারণা করা হয়।[৪] ফসল রোপন, কৃষির প্রচলন শুরু হলেও কৃষি, চাষাবাদ, খাদ্য উৎপাদন, খাদ্য মজুদ রাখা ইত্যাদি সম্পর্কে মানুষের তখন কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। যথেচ্ছারভাবে চাষাবাদ এবং খাদ্যের জন্য সম্পূর্ণ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল মানুষ। পরবর্তীতে, আজ থেকে মাত্র ১৫ হাজার বছর আগে শষ্য, বীজ বোনার কৌশল, সেচ, সারের ব্যবহার, ফসলের প্রতি ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ দূর করার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি মানুষ ধীরে ধীরে রপ্ত করে কৃষিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পেরেছে। মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল যেমন মিশর, ফিলিস্তিন, মেসোপটেমিয়ায় আজ থেকে ১১ হাজার বছর আগে খাদ্যশষ্যকে মানুষ প্রথম নিজেদের গার্হস্থ্যের আয়ত্তে আনে। খাদ্য চাহিদা পূরণ করে আপদকালীন সময়ের জন্য অধিক খাদ্য মজুদ রাখার প্রয়োজন থেকে অধিক ফলনশীল ধান, গম, ভুট্টা উৎপাদনের জন্য শুরু থেকে কৃত্রিম নির্বাচন চালিয়ে আসছে।

জীববিজ্ঞানীদের ধারণা কৃষিকাজের গোড়ার দিকে হোমো সেপিয়েন্সরা অসচেতনভাবেই কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়া চালু করেছিল। সবাই জানেন 'কৃষকরা ক্ষেতে বীজ বোনেন ঘন করে। যাতে চারাগুলো নিজেদের মধ্যেকার প্রতিযোগিতা করে বড় হবে, কিন্তু একদম উঁচু লকলকে হতে পারবে না। এটা উদ্ভিদের আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামের উদাহরণ। কৃষকেরা ফসলের ক্ষেত থেকে আগাছা তুলে ফেলেন সুরক্ষার জন্য, গৃহপালিত পশুর শরীর থেকে উকুন জাতীয় পরজীবী বেছে ফেলে দিয়ে তাদের সুস্থ রাখেন। প্রকৃতিতে বেঁচে থাকতে তাদের সহায়তা করা হয়। নইলে আগাছাগুলো আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামরত চারাগাছগুলিকে দূর করে ক্ষেতকে খুব দ্রুত জঙ্গল বানিয়ে ফেলতো। বন্য জন্তুর আক্রমণ থেকে গৃহপালিত গরু, ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি প্রাণীকে রক্ষার জন্য শক্ত বেড়া দিয়ে গোয়াল ঘর নির্মাণ করে দেন। উকুন জাতীয় পরজীবীরা গৃহপালিত পশুর রক্ত খেয়ে রক্তশূন্য করে ফেলতো, বিভিন্ন ধরনের মহামারী রোগ ছড়িয়ে নির্বংশ করে ফেলতো। শিকারী প্রাণীরাও গৃহপালিত প্রাণীদের হত্যা করে ফেলতো।'[৪] কৃষিতে যে বৈশিষ্ট্যগুলি (traits) সচেতনভাবে বা অসচেতনভাবে কৃষকেরা কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের আবাদের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করতো মোটামুটি সেগুলি ছিল

: দ্রুত বর্ধনশীল এবং বেশি ফলনে প্রজননক্ষম বীজ-শষ্য, বিভিন্ন বিরূপ ঋতুতে আবাদে সক্ষম, পোকামাকড় থেকে মুক্ত, সুস্থ সবল সতেজ বীজ-শষ্য, বাহ্যিক দিক থেকে আকষর্ণীয় ইত্যাদি। কৃষিতে এসব ভ্যারিয়েশন বাছাই করে মানুষ খাদ্যশষ্যের প্রচুর জাত উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে গত কয়েক হাজার বছর ধরে। শুধু কৃষিকাজে নয়, হাঁস-মুরগি-গরু-ছাগল-ভেড়া ইত্যাদির কৃত্রিম প্রজননকারী বা খামারিরা বহু আগে থেকে কৃত্রিম নির্বাচন পরিচালনা করে আসছে। কৃত্রিম প্রজননকারীদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হত যে বৈশিষ্ট্যগুলি তা প্রাণীর নমনীয় খাদ্যাভ্যাস, দ্রুত বর্ধনশীল, রঙ ও আয়তনে তুলনামূলক আকর্ষণীয়, মানুষের চাহিদা-প্রয়োজন অধিক পরিমাণে পূরণ করতে সক্ষম ইত্যাদি। যেমন কোনো গরুর পপুলেশনে অধিক দুধ দিতে সক্ষম গরুগুলিকে বংশবৃদ্ধি করতে দেয়া হল। কম দুধের গরুগুলিকে তেমন বংশবৃদ্ধি করতে দেয়া হল না। প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এভাবে কৃত্রিম নির্বাচন চলতে থাকলে একসময় এই গরুর পপুলেশনে শুধু অধিক দুধ দানে সক্ষম গরুগুলি টিকে থাকবে, বাকিগুলির ক্রমে বিলুপ্তি ঘটবে। শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য প্রজননকারীরা প্রাণীর কৃত্রিম প্রজনন ঘটান না। গরুর অধিক দুধ দেওয়া ছাড়াও চাষাবাদে, হালের লাঙল টানার জন্য, মানুষের মাংসের খাদ্যাভ্যাসের চাহিদা পূরণের জন্য হৃষ্টপুষ্ট গরু বাছাইকরণ চলে। ইদানীং গরু মোটা তাজা করার জন্য বিভিন্ন কৃত্রিম পদ্ধতি ও ঔষধ ব্যবহার করা হয়। ফার্মের অধিক ডিমওয়ালা মুরগি, মোটাসোটা মুরগি মানুষের খাদ্যের জন্য কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে তৈরি করা হয় বংশপরম্পরায়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এভাবে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে প্রজন্মান্তরে বাছাইকরণ ঘটে। বর্তমানকালে আমরা যে এতো নতুন নতুন জাতের খাদ্যশষ্য, শাকসব্জি, ফলমূল, গৃহপালিত প্রাণী দেখি, তার বেশিরভাগ আমাদের কৃষক, খামারিরা নিজেদের পছন্দমত ভ্যারিয়েশন বাছাই করেছেন। প্রজন্ম পর প্রজন্ম ধরে এভাবে ভ্যারিয়েশন বাছাই চলতে চলতে নতুন নতুন উপপ্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। নতুন নতুন উপপ্রজাতি থেকে একসময় সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতিরও উদ্ভব ঘটেছে।

সবসময় ভ্যারিয়েশন বাছাই করে যে নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটানো হয়েছে এমন নয়, কিছু ক্ষেত্রে সংকরজাত-ও তৈরি করা হয়েছে। ডারউইন কৃত্রিম নির্বাচনের উদাহরণ হিসেবে গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে যেমন কুকুর, হাঁস, মুরগি, খরগোশ, কবুতরের প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছিলেন। ডারউইনের মতে, *Columbia livia* বুনো রক জাতীয় কবুতর থেকে বিভিন্ন জাতের কবুতরের উদ্ভব ঘটেছে। জীববিজ্ঞানীদের মতে বর্তমানে ৩০৯ প্রজাতির কবুতর রয়েছে। এবং এই বিভিন্ন প্রজাতির কবুতর উদ্ভবের পিছনে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছে মানুষের কৃত্রিম নির্বাচন। সবচেয়ে প্রাচীন গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে কুকরকে গৃহপালনের মাধ্যমে মানুষ অনেকগুলো জাত যেমন গ্রেহাউন্ড, ব্লাডহাউন্ড, টেরিয়ার, স্পেনিয়েল, বুলডগ তৈরি করেছে। ডারউইন বলেছেন, একই বুনো উৎস থেকে এদের বিভিন্ন জাতের উৎপত্তি। অনুমান করা হয় এই কুকুরগুলোর পূর্বপুরুষ আজ থেকে বার হাজার থেকে চৌদ্দ হাজার বছর আগেকার (মধ্যপ্রস্তর যুগ) এক ধরনের ছোট মুখওয়ালা পূর্ব এশিয়ান নেকড়ে। উল্লেখ্য ২০০২ সালের নভেম্বরের ২২ তারিখে প্রকাশিত বিজ্ঞান পত্রিকা *Science*-এর নিবন্ধে দেখা যায়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের গৃহপালিত কুকুরের সকল বড় পপুলেশন থেকে ৬৫৪টি নমুনা সংগ্রহ করে মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ (mtDNA) সিকুয়েন্স পরীক্ষায় এদের পূর্বপুরুষ ১৫ হাজার আগেকার পূর্ব এশিয়ান নেকড়ে সম্পর্কে জোরালো প্রমাণ পাওয়া গেছে।[৫] কুকুরের মাইটোকন্ড্রিয়াল ডিএনএ সিকুয়েন্সের এ গবেষণা রিপোর্ট ডারউইনের বক্তব্যেরই সত্যতা নিশ্চিত করলো। ৯ হাজার থেকে ১১ হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় বন্য প্রাণী mouflon-কে পোষ মানিয়ে ভেড়া উৎপাদন করা হয়েছে। খুব সম্ভবত চার হাজার পাঁচশ বছর আগে মধ্য এশিয়ায় ঘোড়া প্রথম মানুষের গৃহপালিত পশু স্থান পায়। প্রাণীবিজ্ঞানীদের মধ্যে যদিও মুরগির উদ্ভব নিয়ে ভিন্নমত রয়েছে, তবে বেশিরভাগ প্রাণীবিজ্ঞানী মনে করেন এবং প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাও সাক্ষ্য দেয় চীন এবং ভারতে লাল বন্য মুরগি (*Gallus gallus*) যা আমাদের দেশের দেশি মুরগির মত দেখতে—বর্তমানকালের সব প্রজাতির মুরগির পূর্বপুরুষ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে পশ্চিম ইরানের জ্যাগরোস (zagros) পর্বতে ছাগল প্রথম গৃহপালনের মধ্যে আসে। ধারণা করা হয়, মধ্যপ্রাচ্য এবং চীনদেশে একই সময়ে শূকর মানুষের পোষ মেনেছিল। আজ থেকে ১০ হাজার বছর আগে ভারত, মধ্যপ্রাচ্য এবং খুব সম্ভবত পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকার সাব-সাহারান অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবেই এক ধরনের হৃষ্টপুষ্ট মোষের মত দেখতে বন্যপ্রাণী aurochs-কে গৃহপালনের মাধ্যমে গবাদিপশুর বিভিন্ন জাত তৈরি করা হয়েছে। বন্য এ প্রাণীটি গত সতের শতকের (১৬২৭ সালের) দিকে ইউরোপ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ২০০৭ সালের এক গবেষণা থেকে জানা যায়, বন্য বিড়াল মানুষের পোষ মেনেছিল আজ থেকে প্রায় নয় হাজার বছর আগে পারস্য উপসাগরের উত্তরাঞ্চলে বিশ্বের প্রথমদিককার কৃষিভিত্তিক গ্রামে। এবং বর্তমানকালের বেশিরভাগ গৃহপালিত বিড়ালের পূর্বপুরুষ হচ্ছে ঐ অঞ্চলের পাঁচটি মাতৃতান্ত্রিক পূর্বপুরুষ (matrilineal ancestor)।[৬] ধারণা করা হয়, বন্যবিড়ালগুলো সেসময়ে মানুষের আশ্রয়ে এসেছিল পোষ মেনেছিল কারণ 'আপদকালীন সময়ের জন্য কৃষিশষ্য, খাদ্য মজুদ করার ফলে মানুষের আবাসস্থলের আশেপাশে ইঁদুর, ছুঁচো, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি প্রাণী আশ্রয় নেয়। এদের খাদ্য হচ্ছে মানুষের খাদ্যশষ্য ধান-গম-ভুট্টোর বীজ, ফলমূল, আমিষ জাতীয় খাবার মাছ-মাংস, (মানুষের) ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাবার ইত্যাদি। বন্যবিড়াল যেমন এসব প্রাণীকে শিকার করে আবার মানুষের আমিষ জাতীয় খাদ্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ আছে। ফলে মানুষের আবাসস্থলের আশেপাশে বন্যবিড়াল তার নিজের খাদ্যের সংস্থান, নিরাপদ আবাসস্থল, তুলনামূলক কম প্রতিযোগিতাময় পরিবেশ পায়। বনের বিশাল পরিবেশে খাদ্যের যোগান তুলনামূলক কষ্টসাধ্য। এবং

বনে বন্যবিড়ালের অনেক বড় পপুলেশনের তুলনায় মানুষের বাসস্থানের আশেপাশে বন্যবিড়ালের ছোট পপুলেশনে সীমিত আন্তঃপ্রজাতিক সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়।' হয়তো এ ব্যাখ্যাটি মানুষের দ্বারা গৃহপালিত বেশিরভাগ পশুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। ডারউইন কৃত্রিম নির্বাচনের মাধ্যমে গৃহপালিত প্রাণীর বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ছাড়াও উদ্ভিদ-ফুল-ফল, সব্জি ইত্যাদি নিত্যদিনের ব্যবহার্যের চাক্ষুস প্রমাণ তুলে ধরেন। একটা পর একটা জীবের কৃত্রিম নির্বাচনের বর্ণনা প্রদান করে ডারউইন শেষে খুব যৌক্তিক প্রশ্ন করেন : 'মানুষ সুশৃঙ্খল ও অসচেতন নির্বাচন দিয়ে বড় রকমের সাফল্য লাভ করেছে। তাহলে প্রকৃতি কি এরকম কিছু করতে পারে না? মানুষ কেবল বাইরের এবং দৃশ্যমান চারিত্র্য (বৈশিষ্ট্য) নিয়ে কাজ করে। প্রকৃতি বাহ্যিক চেহারা নিয়ে মোটেও আগ্রহী নয়। প্রকৃতির কাছে একমাত্র বিষয় হচ্ছে চারিত্র্যটি জীবের কোনো প্রয়োজনে আসে কি-না। ...নির্বাচন প্রক্রিয়া মন্থর হলেও দুর্বল মানুষ যদি তার কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় এত কিছু করতে পারে তাহলে প্রকৃতি যার সময়ের পরিসীমা নেই, বহুকালব্যাপী সব জীবের মধ্যে সহ-অভিযোজনের সৌন্দর্য, জটিলতা, জীবনের ভৌত পরিবেশের সাথে অভিযোজন সবই প্রাকৃতিক নির্বাচন দিয়েই প্রভাবিত হয়েছে।'[৯]

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তনের বিরোধিতা করে অনেক সময় অভিযোগ করা হয় '*কৃত্রিম নির্বাচনের পিছনে বেশিরভাগ সময় মানুষের সচেতন পরিকল্পনা-উদ্দেশ্য কাজ করে। আর জৈববিবর্তন তত্ত্বে বলা হয় প্রকৃতিতে কোনো পরিকল্পনা-উদ্দেশ্য কাজ করে না। তাহলে এই দুটি বিষয় তো স্ব-বিরোধী। এভাবে একটা পদ্ধতি দিয়ে অন্যটি ব্যাখ্যা করা যায় না।*'

সহজ উত্তর হচ্ছে মোটেও স্ববিরোধী নয়। এভাবে দুটি পদ্ধতিকে 'স্ববিরোধী' ভাবা বা দেখা ঠিক নয়। বিষয়টি একটি ছোট্ট উদাহরণের মাধ্যমে তুলে ধরা হল : আমাদের চারপাশে প্রাকৃতিক পানি পাওয়া যায়। মাটির নীচে, খালে, বিলে, হ্রদে, নদীতে, সমুদ্রে। প্রকৃতিতে পানি কিভাবে তৈরি হয়েছে তা আমরা কেউ চাক্ষুস দেখিনি। খালি চোখে পানির রাসায়নিক গঠন দেখতে পারি না। গ্যাসীয় অণু খালি চোখে দেখা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে আমরা জানি পানির অণুর রাসায়নিক গঠন হচ্ছে দুই পরমাণু হাইড্রোজেনের সাথে এক পরমাণু অক্সিজেন গ্যাসের মিশ্রণ। এখন ল্যাবরেটরিতে হাইড্রোজেন-অক্সিজেন গ্যাস মিশ্রণে কৃত্রিম পদ্ধতিতে পানি তৈরি করা মোটেও জটিল কাজ নয়। তাহলে কী বলা যায়, মানুষের তৈরি কৃত্রিম পদ্ধতি দিয়ে প্রাকৃতিক পানির রাসায়নিক গঠনের সঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না? প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বা বাস্তবতাকে মানুষ তার নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচক্ষণতার দ্বারা কৃত্রিমভাবে সীমিত পরিসরে ঘটিয়ে ব্যাখ্যা করছে। শুধু জীববিজ্ঞানে নয়, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সবকটি শাখাতেই প্রচুর উদাহরণ রয়েছে কৃত্রিমভাবে সীমিত পরিসরে গবেষণার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এটি বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সম্প্রতি ২০০৮ সালে শুরু হওয়া সার্ন (European Organization for Nuclear Research)-এর নেতৃত্বে বিশ্বের বৃহত্তম বিজ্ঞান প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম '*লার্জ হেড্রন কোলাইডার*' প্রকল্পের কথা সবাই মোটামুটি জানি। বিশ্বের ১০০টি দেশের দশ হাজার পদার্থবিজ্ঞানী-প্রকৌশলী এ গবেষণা কাজে জড়িত আছেন। স্পেন, ফ্রান্স-সুইজারল্যান্ডের সীমান্ত এলাকার দশ মিটার ভূগর্ভে ২৭ কিলোমিটার দীর্ঘ গোলাকার টানেলে পদার্থবিজ্ঞানের এ সময়কার সবচেয়ে জটিল গবেষণা কাজটি পরিচালিত হচ্ছে। সুদূর অতীতে গিয়ে মানুষের পক্ষে চাক্ষুস পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব নয় বিগব্যাঙের সময় প্রকৃতি কি অবস্থায় ছিল বা মহাবিশ্বের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল। *এলএইচসি* প্রকল্পে পদার্থবিজ্ঞানীরা বীমের মধ্যে তীব্র গতিতে বিপরীতমুখী একগুচ্ছ প্রোটন কণার সংঘর্ষ ঘটিয়ে সীমিত পরিসরে বিগব্যাঙের সময়কালের একটি কৃত্রিম অবস্থা তৈরি করতে চাচ্ছেন। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন এর মাধ্যমে পদার্থবিজ্ঞানের একদম মৌলিক কিছু বিষয় যেমন প্রকৃতির আইন (laws of Nature) সম্পর্কে ইম্পিরিকাল তথ্য সংগ্রহ করা যাবে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স এবং সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মধ্যেকার বিষয়গুলো যাচাই করা যাবে এবং মহাবিশ্বের উদ্ভব বা বিগব্যাঙের সময়কার একদম প্রাক-প্রাথমিক অবস্থা সম্পর্কে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।[১০] এছাড়া পৃথিবীতে প্রাণ উদ্ভবের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াটি বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ১৯২০ সালে রাশিয়ার প্রাণ-রসায়ন বিজ্ঞানী আলেক্সান্ডার অপারিন এবং ইংরেজ জীববিজ্ঞানী জে. বি. এস. হ্যালডেন স্বতন্ত্র গবেষণার কথা এখানে স্মরণ করতে পারি। ১৯৫৩ সালে হ্যারল্ড ইউরি-স্ট্যানলি মিলারের গবেষণার কথাও প্রাসঙ্গিক। বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম পরিবেশে তৈরি এসব গবেষণা কাজ প্রাকৃতিক ঘটনাবলী বা বাস্তবতাকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে বোঝার জন্য, জানার জন্য প্রয়োগ করেছেন। এখানে প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম পদ্ধতিকে আলাদা করে দেখা বা 'স্ববিরোধী' ভাবনা অবান্তর। প্রকৃতির বাস্তবতাকে মানুষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে কিনা সেটি আসল কথা।

আমাদের চারপাশে যেমন কৃত্রিম নির্বাচনের উদাহরণের অভাব নেই তেমনি প্রাকৃতিক নির্বাচনেরও প্রচুর চাক্ষুস প্রমাণ রয়েছে। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন হয় না—এমন কথা স্পষ্টই ভ্রান্ত, মিথ্যে। এটা সত্য যে কৃত্রিম নির্বাচন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে পদ্ধতিগত অনেক মিল থাকলেও কিছু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। মানুষ বহুকাল আগে থেকে অসচেতনভাবে জীবজগতে কৃত্রিম নির্বাচন পরিচালনা করে আসছে। সচেতনভাবেও কৃত্রিম নির্বাচন পরিচালনা বেশ আগের ঘটনা। সাধারণভাবে বলা যায়, প্রাকৃতিক নির্বাচন ঘটে যখন কোনো জীবের পপুলেশনে বা প্রজাতিতে কোনো নির্দিষ্ট ভ্যারিয়েশন অন্য ভ্যারিয়েশনের তুলনায়

অধিক বংশধর রেখে যেতে পারে বংশপরম্পারায়। কিছু ভ্যারিয়েশন এমনিতে পরিবেশের পার্থক্যের কারণে কোনো একক জীবে হতে পারে (যেমন রোদে পুড়ে দেহের রঙ নষ্ট হতে পারে) কিংবা দেহকোষে কোনো মিউটেশনের কারণে হতে পারে কিন্তু তা পরবর্তী বংশধরে সঞ্চারিত হয় না। জননকোষে জিনেটিক পরিবর্তনের কারণে যেসব ভ্যারিয়েশন কোনো প্রজাতিতে বা পপুলেশনে দেখা যায় তাই পরবর্তী বংশধরে সঞ্চারিত হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচনের অংশ হতে হলে ভ্যারিয়েশনকে অবশ্যই জননকোষের জিনেটিক পরিবর্তন হতে হবে। উক্ত ভ্যারিয়েশনটি যদি পরিবেশ থেকে কোনো অতিরিক্ত সুবিধা পায় তবে সেই ভ্যারিয়েশনের জীবটি অধিক বংশধর রেখে যেতে পারবে প্রকৃতিতে, অন্য ভ্যারিয়েশনগুলির তুলনায়। এ ধারা অব্যাহত থাকলে পরিবেশের সাপেক্ষে উপযুক্ত ভ্যারিয়েশন ছড়িয়ে পড়বে গোটা পপুলেশনে এবং এতে পপুলেশনের পূর্বের জিনপুলের (জিনভাণ্ডার) বদল ঘটবে। এভাবে পপুলেশনের বিবর্তন ঘটবে। কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়াটিও মোটামুটি এরকম। কোনো প্রজাতিতে বা পপুলেশনে বিভিন্ন ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন জীব বসবাস করে। এই বিভিন্ন ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন জীব থেকে মানুষ তার নিজের পছন্দমত এবং প্রয়োজনীয় এক বা একাধিক ভ্যারিয়েশন বাছাই করে নেয়। যেমন ঘোড়ার পপুলেশন থেকে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার জন্য শক্ত সমর্থ সবল ঘোড়াকে বাছাই করা হয়। দুধের চাহিদা পূরণের জন্য গরুর ফার্মে অধিক দুধেল গরুগুলি বাছাই করা হয়। গরুর মাংস বিক্রি করে অর্থ উপার্জনের ইচ্ছা থাকলে বড়সড় অধিক মাংসের অধিকারী গরুগুলি বাছাই করা হয়। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফুল গাছ হলে সাধারণত বড় আকৃতির পাপড়িবিশিষ্ট, অধিক বর্ণিল, সুগন্ধযুক্ত বৈশিষ্ট্যের ফুল গাছ বাছাই করা হয়। এদের পরাগায়ণ বেশি ঘটানো হয় যাতে অধিক বংশধর রেখে যেতে পারে। এভাবে মানুষ তার পছন্দমত চাহিদা পূরণের উদ্দেশ্যে জীবজগতে কৃত্রিম নির্বাচন চালায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলতে থাকা মানুষের নির্বাচিত ভ্যারিয়েশনটি একসময় গোটা পপুলেশনে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে পপুলেশনের পূর্বের জিনগত কাঠামো বা সাধারণ জিনভাণ্ডারের পরিবর্তন ঘটে। পপুলেশনের বিবর্তন ঘটে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাথে কৃত্রিম নির্বাচনের কয়েকটি পার্থক্য হচ্ছে : (১) কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো প্রজাতি বা পপুলেশন থেকে পছন্দসই ভ্যারিয়েশন বা বৈশিষ্ট্য বাছাইয়ের পিছনে মানুষের এক বা একাধিক উদ্দেশ্য কাজ করতে পারে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রকৃতির এ ধরনের কোনো উদ্দেশ্য বা পূর্বপরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায় না। আর প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়া কোনো কারণ নয়। জীবজগতের কয়েকটি ঘটনার সম্মিলিত ফলাফল। (২) মানুষের নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে যার দ্বারা কৃত্রিম নির্বাচন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। প্রকৃতিতে এমনটি নেই। (৩) প্রাকৃতিক নির্বাচনের তুলনায় কৃত্রিম নির্বাচন তুলনামূলক অনেক বেশি দ্রুত গতির। (৪) কৃত্রিম নির্বাচনের গোটা প্রক্রিয়াটি মানুষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। মানুষ চাইলে তার পছন্দের ভ্যারিয়েশনের বাইরে অন্য যে কোনো ভ্যারিয়েশনকে প্রজননে-বংশবিস্তারে বাঁধা দিতে পারে, বংশধর নির্মূল করতে পারে সঙ্গে সঙ্গেই। কিন্তু প্রকৃতি সরাসরি প্রজননসক্ষম জীবের প্রজনন কাজে বা বংশবিস্তারে বাঁধা দেয় না। উপযুক্ত ভ্যারিয়েশনের বাইরে অন্য ভ্যারিয়েশনগুলির বংশধর এত সহজে নির্মূলও হয় না। তাই প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন অনেক ক্ষেত্রে ধীর গতির হয়ে থাকে। (৫) কৃত্রিম নির্বাচন দ্বারা গবেষণাগারে এবং গবেষণাগারের বাইরে জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া চাক্ষুস প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াও চাক্ষুস প্রমাণ করা গেছে। (৬) প্রাকৃতিক নির্বাচনে 'পরিবেশ' প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের বিবর্তনের ক্ষেত্রে শিকারী কীটপতঙ্গ, পরাগায়ণের ক্ষমতা, মাটির উর্বরাশক্তি, আবহাওয়ার অবস্থা, খাদ্যের যোগান, সূর্যের তাপ ইত্যাদির ভূমিকা অপরিসীম। উদ্ভিদের প্রত্যেক ভ্যারিয়েশনকে এসব অবস্থা মোকাবেলা করে জীবন সংগ্রামে টিকে থাকতে হয়। বংশধর রেখে যেতে হয়। যে ভ্যারিয়েশনটি পরিবেশের সাপেক্ষে যত বেশি উপযুক্ত সেই ভ্যারিয়েশনের বংশধর টিকে থাকে। ভ্যারিয়েশনটি ছড়িয়ে পড়ে বংশপরম্পরায়। কিন্তু কৃত্রিম নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষ নির্ধারণ করে কোন ভ্যারিয়েশন তার দরকার। কোন ভ্যারিয়েশন তার চাহিদা পূরণ করতে পারবে, সেই ভ্যারিয়েশনের বংশধর মানুষ টিকিয়ে রাখে।

জৈববিবর্তনের বিরোধিতাকারীরা ব্যঙ্গ করে একসময় বলতেন "*একটি ব্যাঙ যদি হুট করে রাজপুত্রে পরিণত হয়ে যায় তখন সে কাহিনিকে আমরা বলি রূপকথা, কিন্তু তার সাথে যদি আমরা কোটি কোটি বছর যোগ করি তখন এটা হয়ে যায় বিবর্তনবাদী বিজ্ঞান।*"

জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকায় বিরোধিতাকারীদের ফ্যালাসি (হেত্বাভাস) থেকে এই ধরনের ব্যঙ্গের সূত্রপাত। বিজ্ঞান (বা যুক্তি) আর ফ্যালাসির মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে বিজ্ঞান/যুক্তিতে বিশ্লেষণ থাকে, উপাত্ত থাকে, নির্মোহ হয়ে তথ্য নিংড়ে দেখার মানসিকতা থাকে, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু ফ্যালাসিতে এসব কিছু থাকে না। থাকে শুধু গোঁজামিল। তিলকে তাল বানিয়ে দেখার প্রবণতা কাজ করে। ফ্যালাসির খুব সাধারণ একটি উদাহরণ দেই : প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ মানুষের গালে দাঁড়ি হয়। রহিম একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ। তার গালে দাঁড়ি আছে। আবার ছাগলের থুতুনিতে দাঁড়ি থাকে। অতএব রহিম একজন 'ছাগল' জাতীয় পুরুষ। এটা মোটেও যুক্তি বা বিজ্ঞানসম্মত ধারণা নয়। স্পষ্টই ফ্যালাসি।

আমরা এখানে ফ্যালাসির প্রসঙ্গটি বাদ রেখে অন্য প্রসঙ্গে যাই। জীববিজ্ঞানে বা জৈববিবর্তনে যাদের আগ্রহ আছে তাদের অনেকেই মনে করেন, (প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায়) জীবের বিবর্তন খুব জটিল এক প্রক্রিয়া এবং এর জন্য দীর্ঘ সময় প্রয়োজন। হাজার হাজার প্রজন্মে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর লাগতে পারে এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হতে কিংবা কোনো জীবের পপুলেশনের জিনপুলের পরিবর্তন হতে। চার্লস ডারউইন নিজেও *অরিজিন অব স্পিসিজ* গ্রন্থে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়াকে 'অত্যন্ত ধীর গতির পরিবর্তন' বলে ব্যাখ্যা করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক স্টিফেন আর. পালুম্বি (Stephen R. Palumbi) মনে করেন 'অত্যন্ত ধীর গতির' প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন–ধারণায় ডারউইন তার সুহৃদ চার্লস লায়েলের (১৭৯৭-১৮৭৫) ভূতাত্ত্বিক তত্ত্ব দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বিগল জাহাজে ভ্রমণের (১৮৩১-১৮৩৬) সময় ডারউইন চার্লস লায়েলের তিন খণ্ডের বই *Principles of Geology* পাঠ করেন। চার্লস লায়েল তার গ্রন্থে ইংল্যান্ডের ভূস্থরের গঠন নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। ঐ সময়ে প্রচলিত ধারণা ছিল আমাদের পৃথিবী খুব বেশি দিনের পুরানো নয়। ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্ব সালের ২৩ অক্টোবর ঈশ্বর পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। সে হিসেবে পৃথিবীর বয়স মোটে ছয় হাজার বছরের কাছাকাছি। চার্লস লায়েল তার গ্রন্থে 'অল্প বয়সী' পৃথিবীর এ ধারণাটি অস্বীকার করেন। তিনি ইংল্যান্ডের চারপাশে স্তরে স্তরে সজ্জিত ভূস্থরের গঠন ব্যাখ্যা করেন। অত্যন্ত ধীর গতিতে পাথরের এ স্তরসমূহ ঘটিত হয়েছে, তাই পৃথিবীর ভূস্থরের গঠনের জন্য মাত্র ছয় হাজার বছর যথেষ্ট নয়। কমপক্ষে শত মিলিয়ন বছর প্রয়োজন। ডারউইনও ইংল্যান্ডের দক্ষিণের ওয়েল্ড উপত্যকার ভূমি ক্ষয়ের হার হিসেব করে পৃথিবীর বয়স কমপক্ষে ৩০০ মিলিয়ন বছর বের করলেন। ডারউইন শুধু পৃথিবীর ভূস্থর গঠন দীর্ঘ সময়ে গঠিত হয়েছে তা মনে করতেন না, প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনো জীবের পপুলেশনের পরিবর্তনের মাধ্যমে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য অতি দীর্ঘ সময় প্রয়োজন বলে মনে করতেন। *অরিজিন অব স্পিসিজ* গ্রন্থ রচনায় *Principles of Geology* এবং চার্লস লায়েলের চিন্তার প্রভাব ডারউইন নিজে এভাবে বর্ণনা করেছেন : "I always feel as if my books came half out of Lyell's brain, for I have always thought that the great merit of the *Priciples*, was that it altered the whole tone of one's mind & therefore that when seeing a thing never seen by Lyell, one yet saw it partially through his eyes."[১১]

বর্তমানকালে অধ্যাপক স্টিফেন পালুম্বিসহ অনেক জীববিজ্ঞানী মনে করেন প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তনের গতি 'সবসময় অতি মন্থর এবং জটিল'—এ ধারণাটি সর্বক্ষেত্রে সঠিক নয়। সকল জীবের ক্ষেত্রে বিবর্তন অত্যন্ত ধীর গতির অথবা সকল জীবের ক্ষেত্রে বিবর্তন অত্যন্ত দ্রুত গতির এমনটি নয়। জীবজগতে যেমন ধীর গতির বিবর্তন প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল তেমনি অনেক ক্ষেত্রে তুলনামূলক দ্রুত গতির জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়াও ক্রিয়াশীল। দ্রুত গতির বিবর্তনের জন্য লক্ষ লক্ষ বছর সময়ের প্রয়োজন নেই। বিভিন্ন ধরনের অণুজীব নিয়ে গবেষণায় জীববিজ্ঞানীরা এ ধরনের প্রচুর দ্রুত গতির জীবের বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। যেমন এইচআইভি (Human immunodeficiency Virus)।

২০০৮ সালের এক হিসেবে পৃথিবীতে প্রায় ৩৩.৪ মিলিয়ন মানুষ এইচআইভিতে আক্রান্ত রয়েছে। ১৯৮১ সালের পর থেকে এ পর্যন্ত ২৫ মিলিয়ন ব্যক্তি এইডস রোগে মারা গেছে।[১২] বিশ্বে আর কোনো জীবাণুতে এতো বেশি সংখ্যক লোকের আক্রান্ত হওয়ার নজির নেই। জানা মতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর একমাত্র ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতেই সর্বোচ্চ সংখ্যক ব্যক্তি মারা গিয়েছিল। এইচআইভি'র জিন সিকুয়েন্স বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে ভাইরাসের পারিবারিক বৃক্ষে এইচআইভি'র 'নিকট আত্মীয়' হল *এসআইভি* (Simian immunodeficiency Virus) এবং ফিলাইন (feline) ভাইরাস থেকে বেশ দূরত্বে অবস্থান করছে। আবার ভাইরাসের ফ্যামিলি ট্রি-তে এইচআইভি'র অবস্থান দুটি জায়গায়। একটি হচ্ছে এইচআইভি-১, যা মানুষের মধ্যে মহামারী 'এইডস' রোগ হিসেবে দেখা দিয়েছে। মানবদেহে পাওয়া এইচআইভি-১-এর সাথে আফ্রিকার সবুজ বানর, শিম্পাঞ্জির দেহে পাওয়া এইচআইভি জীবাণুর খুব বেশি মিল রয়েছে। ভাইরাসের পারিবারিক বৃক্ষতে অবস্থিত অন্য এইচআইভি'টি হচ্ছে এইচআইভি-২। আফ্রিকার কোনো জীবে এই জীবাণু তেমন একটা পাওয়া যায় না। দেখা গেছে জীবদেহে সংক্রমিত হওয়ার ক্ষমতা এর অনেক কম। মিউটেশনের হারও অনেক কম। এইডস রোগের জন্য এইচআইভি-২ জীবাণু দায়ী নয়। দায়ী শুধু এইচআইভি-১ জীবাণু। মানুষের দেহে 'অসূদন' (nonlethal) পরজীবী হিসেবে এইচআইভি-২ 'শান্তশিষ্ট ভদ্র' হয়ে বসবাস করতে পারে। এসআইভি'র জিন সিকুয়েন্সের সাথে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে এইচআইভি-২-এর জিন সিকুয়েন্সের। বিজ্ঞানীরা বলেন পশ্চিম মধ্য-আফ্রিকার শিম্পাঞ্জি থেকে এইচআইভি-১ জীবাণু মানবদেহে প্রবেশ করেছিল। ঠিক কবে এ জীবাণুটি মানবদেহে প্রবেশ করেছে তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও এ জীবাণুটি খুব বেশিদিন আগে মানবদেহে প্রবেশ করে নি বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। ১৯৫৯ সালে কোনো এক কারণে আফ্রিকার দেশ কঙ্গো থেকে ১২১৩টি রক্তরসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু রক্তরসের নমুনা সংগ্রহ করার পর এ নিয়ে কোনো গবেষণা হয় নি। ১৯৯৭ সালে এই নমুনাগুলো হঠাৎ করে উদ্ধার হওয়ায় গবেষণার জন্য আনা হল। দেখা গেল রক্তরসের নমুনাগুলো এইচআইভি পজেটিভ। জিন সিকুয়েন্স গবেষণার মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া গেল, ১৯৫৯ সালের এইচআইভি-১ জীবাণু বর্তমানকালে মানুষের শরীরে সংক্রমিত এইচআইভি-১-এর পূর্বপুরুষ। ইতোমধ্যে বিবর্তনের মাধ্যমে এইচআইভি-১-এর কিছুটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। অর্থাৎ ১৯৫৯ সালের

পূর্বে কোনো এক সময় এটি হয়তো মানুষের দেহে প্রবেশ করেছিল, কিন্তু বিজ্ঞানীরা নিশ্চিৎ বেশি দিন আগে নয়। খুব সম্ভবত ১৮৯০ সাল থেকে ১৯২০ সালের দিকে। তবে মানবদেহে প্রবেশের পর এ জীবাণু 'বিপ্লব' ঘটিয়ে দিয়েছে। গত তিন দশক ধরে বিজ্ঞানীরা এইচআইভি-১-এর কোনো কার্যকর প্রতিষেধক বা ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করতে পারছেন না। কোনো ভ্যাক্সিন দিয়ে এইচআইভি-১ জীবাণুকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। কারণ এইচআইভি-১ জীবাণুর দ্রুত গতির বিবর্তন। মাত্র দুই মাসের ভিতর এইচআইভি-১ জীবাণুর বিবর্তন ঘটে পোষক দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থা (immune system) থেকে নিজেকে 'আড়াল' করে ফেলতে পারে। আমরা জানি 'ভাইরাস' সাধারণত প্রাকৃতিক পরিবেশে খুব দ্রুত বংশবৃদ্ধি করতে পারে। এমন কী গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বাহির থেকে খাদ্য প্রদান করলে এদের বংশবৃদ্ধির হার আরো বৃদ্ধি পায়। যেহেতু এইচআইভি-২ এইডস রোগের জন্য দায়ী নয়, তাই এখানে শুধু এইচআইভি-১ জীবাণুর বিবর্তন নিয়েই আলোচনা করা হবে। এখানে 'এইচআইভি' বলতে 'এইচআইভি-১' জীবাণুকেই বোঝানো হচ্ছে। পোষক প্রজাতিতে (host species) অবস্থিত এইচআইভি-এর কার্যক্রমকে তিনটি ভাগে দেখা যায় : (১) এইচআইভি'র মিউটেশনের হার খুব বেশি। (২) নির্বাচিত ভাইরাসগুলো পোষক দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে কৌশলে ফাঁকি দিতে পারে। পোষক দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে পারে। যাকে আমরা 'এইডস' রোগ বলে থাকি। (৩) নির্বাচিত ভাইরাসগুলো এন্টিভাইরাল ড্রাগ বা ভ্যাক্সিনের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

এইচআইভি অধিক হারে বংশ বৃদ্ধি করে বলে এর মধ্যে মিউটেশনের হারও বেশি। ফলে ভ্যারিয়েশনের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন সম্পর্কে পূর্বে জেনেছি, কোনো জীবের পপুলেশনে যথেষ্ট পরিমাণে ভ্যারিয়েশন থাকলে পরিবর্তিত পরিবেশের সাপেক্ষে উপযুক্ত ভ্যারিয়েশন জীবন সংগ্রামে টিকে যায়, বংশবিস্তার করে। ক্রমে ঐ ভ্যারিয়েশনই গোটা পপুলেশনের ছড়িয়ে পড়ে। পপুলেশনের সাধারণ জিনভাণ্ডারের পরিবর্তন ঘটে। আর সব জীবের মত এইচআইভি'র একটি জিনোম আছে। বেশির ভাগ জীবের (এমন কী খুব সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার) জিনোমে ডিএনএ রয়েছে কিন্তু এইচআইভি'র জিনোমে ডিএনএ নেই, রয়েছে আরএনএ। অবশ্য রেট্রোভাইরাসের জিনোমেও আরএনএ রয়েছে। এইচআইভি'র বংশবিস্তারের জন্য ডিএনএ আছে এমন উপযুক্ত পোষক জীবের প্রয়োজন। এইচআইভি এক্ষেত্রে (বংশ বিস্তারের জন্য) সাধারণত মানুষের দেহকোষকে ব্যবহার করে। এইচআইভি সংক্রামক কোনো জীবাণু নয়। অর্থাৎ বাতাসে উড়ে, হাঁচি-কাশি-স্পর্শের মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায় না। এইচআইভি'র জীবাণু আছে যে জীবদেহে (মানবদেহে) ঐ ব্যক্তির সাথে রক্তের বিনিময় হলে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন হলে। এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের গর্ভের সন্তান এইচআইভিতে আক্রান্ত হতে পারে। অথবা এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ পান করলে। মানুষের দেহকোষে এইচআইভি প্রবেশ করার পর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে লক্ষ লক্ষ কপি রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে নিজেদের বংশ বিস্তার করে। এই কপিগুলো মানবদেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। এরা দেহের রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে থাকে। আক্রান্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। এইচআইভি নিরাময়ে এখন পর্যন্ত ভ্যাক্সিনগুলো ব্যর্থ হচ্ছে। আমরা জানি পোষক দেহে অবস্থিত এইচআইভি পপুলেশনের একটি সাধারণ জিনভাণ্ডার রয়েছে। এইচআইভি জীবাণুর পপুলেশনে সবাই সমান রোগ প্রতিরোধী নয়। ভ্যারিয়েশন অবশ্যই আছে। কেউ কেউ খুব কম মাত্রার ভ্যাক্সিন প্রয়োগে মারা যায়, কাউকে অনেক বেশি মাত্রার ভ্যাক্সিন প্রয়োগে মারতে হয়। ধরা যাক এইচআইভি আক্রান্ত দেহে একটি নির্দিষ্ট মাত্রার ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হল এবং এতে বেশিরভাগ জীবাণুই মারা গেল। অর্থাৎ বেশির ভাগ জীবাণুই 'জীবন সংগ্রামে' টিকে থাকতে পারলো না। কিন্তু ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করার পরও পরিবর্তিত পরিবেশের সাপেক্ষে উপযুক্ত ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন খুব অল্পসংখ্যক ভাইরাস কোনো রকমে টিকে যেতে পারে। যাদেরকে ঐ পূর্বের নির্দিষ্ট মাত্রার ভ্যাক্সিন প্রতিরোধ করতে পারে না। এই টিকে যাওয়া ভাইরাস থেকে আবার নতুন লক্ষ লক্ষ কপি নতুন ভাইরাসের জন্ম হয়। তারা পূর্বের নির্দিষ্ট মাত্রার ভ্যাক্সিন-প্রতিরোধী ক্ষমতা নিয়েই জন্মায়। এর পরের প্রজন্মের ভাইরাসেরও ভ্যাক্সিন-প্রতিরোধী ক্ষমতা থাকে। এভাবে ভাইরাসের পপুলেশনে পূর্বের সাধারণ জিন ভাণ্ডারের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। স্বল্প সময়ের মধ্যে এইচআইভি জীবাণুর কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সাধারণ জিনভাণ্ডারের পরিবর্তন ঘটে যায়। এইচআইভি জীবাণুর দ্রুত বিবর্তনে পোষক দেহে ভ্যাক্সিনটি সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে যায়। রোগীর শরীরের 'রোগ' নিরাময় করতে পারে না।[১৩]

অণুজীব (এইচআইভি) ছাড়াও দ্রুত গতির বিবর্তনের একদম সদ্য সংগৃহীত গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য হচ্ছে গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের ফিঙ্গে পাখি বা ফিঞ্চ পাখি। এদের কেউ কেউ আদর করে ডাকেন 'ডারউইনের ফিঞ্চ'। আমাদের দেশের চড়ুই বা মুনিয়া পাখির মত দেখতে ফিঞ্চ পাখিগুলো। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জ ভ্রমণের সময় ডারউইন চারটি গণের ১৩টি প্রজাতির ফিঞ্চ পাখি দেখতে পান এবং এদের নমুনা সংগ্রহ করেন।[১৪] কিন্তু এগুলো যে 'একই পাখির ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি' কিংবা এরা সবাই যে ফিঞ্চ পাখি তা ডারউইন বুঝতে পারেন নি। পাখিগুলোর দেহের গঠন, রঙ (বাদামি এবং কালো রঙের হয়ে থাকে), পালকের বৈশিষ্ট্য, ঠোঁটের দৈর্ঘ্য-আকৃতি, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদি গভীরভাবে সম্পর্কিত।[১৫] ডারউইন বিগল ভ্রমণ শেষে দেশে ফিরে আসার পর ১৮৩৭ সালে ইংল্যান্ডের পাখি-বিশেষজ্ঞ (Ornithologist) John Gould-এর সহায়তায় ফিঞ্চ পাখিগুলোর নমুনা পরীক্ষা করে ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির বিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন। যাহোক, যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈববিবর্তন বিজ্ঞানী বারবারা রোজম্যারি গ্রান্ট এবং পিটার র‍্যামন্ড গ্রান্ট

দম্পতি গত তিন দশক ধরে গ্যালাপাগোসের বিভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চ পাখি নিয়ে গবেষণা করছেন। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জের ফিঞ্চ পাখিগুলোর খাদ্য হচ্ছে বিভিন্ন ফলের বীজ। খাদ্য হিসেবে এটি তেমন উপযুক্ত নয়। ফলের বীজ খেতে হলে পাখিদের নখর এবং ঠোঁটের ব্যবহার করতে হয় বেশি। তাই দেখা গেছে খাবারের প্রকৃতি অনুযায়ী ফিঞ্চ পাখিদের ঠোঁটের আকার ভিন্ন হয়ে থাকে। কোনো ফিঞ্চ পাখির ঠোঁট স্যুপের চামচের মত, কারো ঠোঁট চিমটির মত, কারো তীক্ষ্ণ ঠোঁট, কারোবা চ্যাপ্টা ঠোঁট, ইত্যাদি। অর্থাৎ ঠোঁটের আকার নির্ধারণ করছে কোন ধরনের বীজ ফিঞ্চ পাখি গ্রহণ করতে পারবে। ঠোঁটের দৈর্ঘ্য যার বড়, সেই পাখি বড় বীজ খেতে পারবে। ছোট দৈর্ঘ্যের ঠোঁট বড় বীজ খেতে পারে কিন্তু তা অনেকটা চপস্টিকের মত হয়ে যায়। স্বাচ্ছন্দের সাথে দ্রুত খাদ্য গ্রহণ এভাবে সম্ভব হয় না। ফিঞ্চ পাখিদের ঠোঁটের দৈর্ঘ্য যদিও মিলিমিটারে হিসাব করতে হয়, রোজম্যারি এবং পিটার গ্রান্টের নেতৃত্বে গবেষকদল পাখিদের ঠোঁটের দৈর্ঘ্যের হিসাব করছেন এবং আবিষ্কার করলেন ছোট দৈর্ঘ্যের ঠোঁটওয়ালা ফিঞ্চ পাখিরা বড় আকারের বীজ খায় না, কিন্তু বড় দৈর্ঘ্যের ঠোঁটওয়ালা ফিঞ্চ পাখিরা বড় আকারের বীজ খাচ্ছে। যখন গ্যালাপাগোস দ্বীপে প্রচুর ফসল হয়, বৃষ্টি হয়, তখন বিভিন্ন উদ্ভিদের বীজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বিভিন্ন সাইজের ছোট, বড়, ভাঙা বীজ। ফিঞ্চ পাখিদের খাদ্যগ্রহণও তখন বেশ ভালো হয়। বীজের আকৃতির সূক্ষ্ম পার্থক্যগুলি তখন ফিঞ্চ পাখিদের কাছে গণ্য হয় না। কিন্তু গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে ফিঞ্চ পাখিদের যখন খাদ্যের সংকট দেখা দেয়, বৃষ্টিপাত কম হয়। সূর্যের তীব্রতাপে দ্বীপের ভূমি অগ্নিতপ্ত হয়। বেশিরভাগ উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়। উদ্ভিদে ফল হয় না। বীজের সংকট তৈরি হয়। তখনই জীবন সংগ্রামের রূঢ় বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় ফিঞ্চ পাখিদের। যে বীজগুলোর ভাঙাচোরা গঠনের কারণে উদ্বৃত ফসলের সময় ফিঞ্চ পাখিরা এড়িয়ে যেত, সেই বীজগুলোই খরার সময় ক্ষুধার্ত ফিঞ্চ পাখিদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সবে ধন নীলমণি হয়ে দেখা দেয়। ফিঞ্চ পাখিদের গড় আয়ু হচ্ছে পাঁচ থেকে দশ বছর। রোজম্যারি এবং পিটার গ্রান্ট দম্পতি তাদের দীর্ঘ তিন দশকের পর্যবেক্ষণে দেখেছেন বিভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চ পাখিদের ঠোঁটের ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন বিভিন্ন পপুলেশন রয়েছে। এসব পপুলেশনের ফিঞ্চ পাখিদের খুব সামান্য পরিমাণ ঠোঁটের আকৃতির পার্থক্যও জীবন-সংগ্রামের মুহূর্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। খাদ্যের অভাবের সময় যেসব ফিঞ্চ পাখির ঠোঁটের দৈর্ঘ্য বড় তারা বেশিদিন বাঁচে তুলনামূলকভাবে যেসব ফিঞ্চ পাখির ঠোঁটের দৈর্ঘ্য ছোট তারা তাড়াতাড়ি মারা যায়। গ্যালাপাগোস দ্বীপপুঞ্জে খরা খুব বেশি দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তাই দুর্ভিক্ষও খুব বেশি দিন থাকে না। আবার বৃষ্টিপাত হয়। বিভিন্ন উদ্ভিদে ফল ধরে। ফিঞ্চ পাখিগুলোও তাদের খাদ্যের নিশ্চয়তা পায়। শুষ্ককালে বিভিন্ন প্রজাতির পপুলেশনে বড় ঠোঁটওয়ালা ফিঞ্চ পাখির সংখ্যা খুব দ্রত বৃদ্ধি পায় এবং বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় বড় ঠোঁটওয়ালা ফিঞ্চ পাখিদের জিন বংশ পরম্পরায় ছড়িয়ে পড়ে।[১৬]

স্টিকেলব্যাক (stickleback) মাছের দৈহিক গঠনের দ্রুত বিবর্তনও এখানে প্রাসঙ্গিক। উত্তর আমেরিকা, উত্তর ইউরোপ, উত্তর এশিয়ার মিঠা বা স্বাদুপানির হ্রদ, নদী, জলাশয়ে এবং সমুদ্রে স্টিকেলব্যাক মাছের কয়েক প্রজাতি (যেমন *Gasterosteus aculeatus, Gasterosteus microcephalus, Gasterosteus wheatlandi, Pungitius hellenicus, Pungitius kaibarae* ইত্যাদি) পাওয়া যায়। স্টিকেলব্যাক মাছ আকারে বেশ ছোট। ৬ থেকে ১০ সেন্টিমিটারের মত লম্বা হয়ে থাকে। প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বুড়ো আঙুলের সমান প্রায়। আজ থেকে প্রায় ১৫ হাজার বছর পূর্বে সর্বশেষ বরফ যুগের সময়, তুষার স্রোতে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যাওয়ায় স্টিকেলব্যাক মাছের সাধারণ পূর্বপুরুষের মূল পপুলেশন সমুদ্র লবনাক্ত পানি থেকে বিভিন্ন এলাকায় নদী, হ্রদ এবং অন্যান্য অগভীর জলাশয়ের মিঠা পানিতে বিভিন্ন পপুলেশনে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। পরবর্তীতে স্টিকেলব্যাক মাছের আলাদা আলাদা প্রজাতি ভিন্ন ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে (লোনা পানি, মিঠা পানি, গভীর জলাশয়ের তলদেশে, অগভীর জলাশয় ইত্যাদি) অভিযোজিত হয়েছে। নরওয়ের জীববিজ্ঞানীরা গত সাড়ে তিন দশক ধরে সমুদ্র, নদী, হ্রদ ইত্যাদি পৃথক পৃথক বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশের (ecological niches) স্টিকেলব্যাক মাছের বংশবিস্তার, জীবনধারা, ক্রমবিকাশ নিয়ে গবেষণা কাজ পরিচালনা করছেন। সমুদ্রের *Gasterosteus aculeatus* প্রজাতির স্টিকেলব্যাক মাছের শরীরে মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত শক্ত এবং বড় ৩৫টি হাঁড় বা কাঁটার স্তর দেখা গেলেও এর মধ্যে তিনটি কাঁটা বেশ বড়। এজন্য একে ডাকা হয় threespine stickleback fish নামে। কিন্তু হ্রদ, নদী কিংবা অন্য মিঠা পানির অগভীর জলাশয়ের স্টিকেলব্যাক মাছের শরীরে বড় তিনটি কাঁটাসহ এতগুলি কাঁটার স্তর দেখা যায় না। বেশিরভাগ মিঠা পানির জলাশয়ে স্টিকেলব্যাক মাছের পপুলেশনে ০ থেকে ৯টি কাঁটা বা হাঁড়ের প্লেট দেখা যায়। শরীরে হাঁড় বা কাঁটার সংখ্যা কমে যাওয়ায় মিঠা পানির স্টিকেলব্যাক মাছের দেহের নমনীয়তা পেয়েছে এবং সাতারেও বাড়তি সুবিধা পেয়েছে। বিজ্ঞানীরা দেখলেন সমুদ্র বা অন্য মুক্ত জলাশয়ে স্টিকেলব্যাক মাছের বড় কাঁটার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বড় এবং শক্ত হাঁড়গুলি স্টিকেলব্যাক মাছের দেহে থাকার ফলে শিকারী মাছ বা জীব থেকে এরা সহজে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। শিকারী মাছ বা জীব সহজে স্টিকেলব্যাক মাছকে কাবু করতে পারে না। সমুদ্রে বসবাসের জন্য এই দৈহিক গঠনটি (বড় ও শক্ত হাঁড়গুলি) স্টিকেলব্যাক মাছের জন্য প্রয়োজন। ফলে স্টিকেলব্যাক মাছের এই দৈহিক বৈশিষ্ট্য সামুদ্রিক প্রতিবেশে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় টিকে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে অগভীর জলাশয়, হ্রদ বা নদীতে বাসকরা স্টিকেলব্যাক মাছের বড় কাঁটার দৈহিক বৈশিষ্ট্য তার জীবনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ফড়িং (dragonfly) বা এই ধরনের জলের কাছাকাছি বাস করা কীটপতঙ্গ সহজে অগভীর মিঠাপানির স্টিকেলব্যাক মাছের পোনার লম্বা

হাঁড়গুলি ধরে শিকার করে। অগভীর মিঠাপানির জলাশয়ে তাই লম্বা তিন কাঁটা বা হাঁড় স্টিকেলব্যাক মাছের শরীরে দেখা যায় না। সেখানে বেশ ছোট আকৃতির এবং একেবারে কম সংখ্যার কাঁটার দৈহিক বৈশিষ্ট্য স্টিকেলব্যাক মাছের মধ্যে বিকশিত হয়েছে।

আলাস্কার লোবার্গ হ্রদে মাত্র এক যুগের মধ্যে ছয়টি প্রজন্মে স্টিকেলব্যাকের কাঁটার বিবর্তন জীববিজ্ঞানীদের কাছে চমকপ্রদ উদাহরণ। ১৯৮২ সালের দিকে সমুদ্রে রাসায়নিক দূষণের ফলে স্টিকেলব্যাক মাছের বেশ বড় পপুলেশন আলাস্কার লোবার্গ হ্রদে এসে উপনিবেশ গড়ে তুলে। জীববিজ্ঞানীরা টানা বারো বছর (১৯৯০ থেকে ২০০১ সাল) নিয়মিত লোবার্গ হ্রদ থেকে স্টিকেলব্যাকের নমুনা সংগ্রহ করতেন তাদের বংশবিস্তার, জীবনধারা, ক্রমবিকাশ পরীক্ষণের জন্য।[১৭] সমুদ্রের লবনাক্ত জল থেকে আসা স্টিকেলব্যাক মাছেরা মাত্র এক দশকের মধ্যেই নতুন পরিবেশ মিঠা পানির হ্রদের সাথে অভিযোজিত হয়ে যায়। জীববিজ্ঞানীরা পরীক্ষণের জন্য সমুদ্র থেকে স্টিকেলব্যাক মাছ সংগ্রহ করে নদীতে ছেড়ে দেখলেন, মাত্র কয়েক প্রজন্মেই স্টিকেলব্যাকের নতুন পপুলেশনে বাড়তি হাঁড়ের স্তর বিলোপ হয়ে গেছে। বিভিন্ন পরিবেশের ভিন্ন ভিন্ন পপুলেশনের স্টিকেলব্যাক মাছের জিনোম বিশ্লেষণ করে দেখা গেল *Pitx1* নামক একটি মাত্র জিন স্টিকেলব্যাক মাছের পেলভিক বা শ্রোণীর হাঁড় হ্রাস-বৃদ্ধির জন্য দায়ী। *Pitx1* জিন জীবের কঙ্কালতন্ত্রের আকৃতি প্রদানের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিন। জীবের দৈহিক গঠনের জন্য দায়ী অন্য জিনগুলোকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে *Pitx1* জিনটি কাজ করে। এ জিন চতুস্পদী উভচর জীব (ব্যাঙ, স্যালামান্ডার ইত্যাদি) এবং স্তন্যপায়ী প্রাণীর (যেমন ইঁদুর) সামনের পা বা বাহু থেকে একটু পৃথকভাবে পিছনের পা বা বাহু গঠনে সাহায্য করে। শ্রোণীর হাঁড়গুলি স্টিকেলব্যাক মাছের পশ্চাদ্‌বাহুর (hindlimbs) অংশ। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় এবং ব্রিটিশ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বংশগতিবিদ (Genetist) ডেভিড কিংসলে, ডল্‌ফ শ্লুটার (Dolph Schluter), জেনি গ্রিমউড, রিচার্ড মায়ার্স এবং তাদের সহযোগী গবেষকরা স্টিকেলব্যাক মাছের শ্রোণীর হাঁড় পরিবর্তন এবং কঙ্কালতন্ত্রের পরিবর্তনের বিষয়টি চাক্ষুস প্রমাণের জন্য একটি পরীক্ষা চালিয়েছেন। তারা সমুদ্রের *Gasterosteus aculeatus* প্রজাতির বড় তিন কাঁটাওয়ালা স্টিকেলব্যাক মাছের কোষ থেকে *Pitx1* জিনটি আলাদা করে অগভীর জলাশয়ের স্টিকেলব্যাক মাছের ডিমে ইনজেকশন দিয়ে প্রবেশ করালেন। দেখা গেল, ডিম থেকে জন্ম নেওয়া মাছের পোনার শরীরে বাড়তি হাঁড়ের স্তর তৈরি হয়েছে, যা এই মাছদের কয়েক প্রজন্ম আগের পূর্বপুরুষদের মধ্যে ছিল না। ভিন্ন ধরনের বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশে একটি মাত্র জিনের পরিবর্তনে স্টিকেলব্যাক মাছের মধ্যে এত সরল উপায়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে শারীরস্থানিক পরিবর্তন ঘটেছে তাতে বিজ্ঞানীরা বেশ অবাকই হয়েছেন। তাই স্টিকেলব্যাক মাছ বর্তমানকালের জীববিজ্ঞানীদের কাছে দ্রুত গতির জীবের বিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।[১৮]

জৈববিবর্তনের আধুনিক সংশ্লেষণী তত্ত্ব (Modern Synthesis Theory of Evolution) দ্বারা '*সকল জীব এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে*'—শুধু এ প্রস্তাবনাকে বুঝায় না। নতুন প্রজাতি উৎপত্তির পাশাপাশি এ তত্ত্ব আমাদের সামনে তুলে ধরে জীবজগতে ভ্যারিয়েশন বা বৈচিত্র্য উদ্ভবের কারণ এবং প্রক্রিয়া, নিজের অজান্তে জীবের জীবন সংগ্রামের মুখোমুখি হওয়া, প্রতিবেশের সাথে জীবের অভিযোজন (Adaptation), জীবের টিকে থাকা, জীবের বিলুপ্তি (Extinction), জীবের ভৌগলিক বিন্যাস, জীবের প্রতিবেশ, জীবের অভিপ্রয়াণ, জীবের পরিবেশগত ভারসাম্য ইত্যাদি বিষয়কে। অর্থাৎ জৈববিবর্তন কি, কেন এবং কিভাবে প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল থাকে বিস্তৃত পরিসরে তার প্রমাণসহ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করাই এ তত্ত্বের আলোচ্য।

বিবর্তন-বিরোধীরা প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জৈববিবর্তনকে অনেক সময় '*নিছক তত্ত্ব*' হিসেবেই উপস্থাপন করেন। প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জীবের বিবর্তন অবশ্যই জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব (পাশপাশি জীবের পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া)। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানের এটমিক থিওরি, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক থিওরি, থিওরি অব রিলেটিভিটি, থিওরি অব গ্র্যাভিটি'র মত প্রমাণিত তত্ত্ব। এটি আর বর্তমানে কোনো অনুকল্প বা ব্যক্তিবিশেষের ধারণা নয়। নয় কতিপয় ব্যক্তির কষ্টকল্পনা 'ঈশ্বরদ্রোহী মতবাদ'। এটা সত্য, ডারউইন যুগে বিজ্ঞান বিশেষ করে জীববিজ্ঞান 'বংশগতি' সম্পর্কে অনেকাংশে পিছিয়ে ছিল। ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' জীবের বিবর্তন সম্পর্কিত অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম ছিল না। ডারউইনের প্রস্তাবনায় বংশগতি সঞ্চারণের প্রক্রিয়া, বংশধরদের মধ্যে ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব সম্পর্কে সঠিক বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল না। স্বাভাবিকভাবে ম্যান্ডেলের বংশগতি সঞ্চারণের সূত্রাবলী, জিনের মিউটেশন, ডিএনএ কোড সম্পর্কে ডারউইন অবহিত ছিলেন না। ডারউইন তার প্রস্তাবনার কিছু সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। *অরিজিন অব স্পিসিজ* গ্রন্থের ষষ্ঠ অধ্যায়ে (Difficulties of the Theory) তুলে ধরেছিলেন এ রকম কিছু সীমাবদ্ধতা, যেমন অন্তর্বর্তী প্রাণীর স্বল্পতা, জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভব সম্পর্কে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাখ্যা, সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে প্রাকৃতিক নির্বাচনের ব্যাখ্যা, প্রজাতির মধ্যে প্রজন্মান্তরে সঞ্চারণশীল বৈশিষ্ট্য কিভাবে সঞ্চারিত হয় ইত্যাদি। ডারউইন সীমাবদ্ধতাগুলো দূরীকরণে কিছু ব্যাখ্যাও প্রদান করেছিলেন কিন্তু সে সময় বংশগতির সঞ্চারণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকায় অনেক প্রশ্নের উত্তর দেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি। পরবর্তীতে বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের দিকে জৈববিবর্তনের সংশ্লেষণী তত্ত্বের উন্মেষের সাথে সাথে ডারউইনের

প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রস্তাবনার সাথে বংশগতি সঞ্চারণের সূত্র, জিনের মিউটেশন ইত্যাদি বিষয়াবলী সংযুক্ত হয়।[১৯] এর ফলে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রস্তাবনার সীমাবদ্ধতাগুলিও দূরীভূত হয়েছে।

সংক্ষেপে বলা যায়, প্রত্নজীববিদ্যা বা ফসিলবিদ্যা থেকে জানা যায়, বিলুপ্ত প্রজাতির জীবনধারা, প্রতিবেশ (Ecology), তাদের জীবনধারণের সময়কাল, এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতির উদ্ভব প্রক্রিয়া ইত্যাদি। তুলনামূলক শারীরসংস্থানবিদ্যা (Comparative Anatomy) জানায় একই পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত জীবসমূহের অঙ্গসংস্থানের সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য। জৈবভূগোল (Bio-Geography) হতে জানতে পারি জীবের ভৌগলিক বিন্যাস, তাদের অভিযোজন, জীবের পরিবেশগত ভারসাম্য, জীবের প্রতিবেশ। যেমন : মারসুপিয়াল প্রাণী কেবল অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকাতে পাওয়া যায়, আফ্রিকাতে নয়। এশিয়া মহাদেশের কিছু দেশের (ভারত, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ইত্যাদি) বনাঞ্চলে বাঘের অস্তিত্ব রয়েছে, আবার এশিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বনগুলোতে বাঘের কোনো অস্তিত্ব নেই কিংবা ইউরোপ-আফ্রিকার বনাঞ্চলে বর্তমানে বাঘের অস্তিত্ব নেই। একসময় তুরস্কের বনে বাঘের বসবাস ছিল। বর্তমানে তুরস্ক থেকে বাঘের বিলুপ্তি ঘটেছে। এই যে পরিবেশ-প্রতিবেশ ভেদে জীবের (উদ্ভিদ-প্রাণী সকলেই) অবস্থান, বণ্টন, অভিযোজন, কিংবা জীবের বিলুপ্তি এসবই জৈবভূগোলের আলোচ্য। যা থেকে জীবের বিবর্তন ধারা সম্পর্কে আমরা প্রচুর তথ্য জানতে পারি। আণবিক জীববিজ্ঞান, বিবর্তনীয় বিকাশমূলক জীববিজ্ঞান (Evolutionary Developmental Biology) হতে জানি, ক্রোমোসোম মিউটেশন, জেনেটিক মিউটেশন কিভাবে ঘটে, জীবদেহে তার প্রভাব, প্রজাতিতে প্রকরণ বা Variation উদ্ভবের কারণ ও প্রক্রিয়া, আণবিক পর্যায়ে বিবর্তনের ধরন, একই সাধারণ পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত জীবসমূহের আণবিক পর্যায়ে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য ইত্যাদি। একটা সময় আণবিক গবেষণায় বিভিন্ন প্রাণীর প্রোটিন বিশ্লেষণ করা হত। কিন্তু এ পরীক্ষাটি অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ, ব্যয়বহুল এবং শ্রমসাধ্য হওয়ায় বৈজ্ঞানিক মহলে পদ্ধতিটি তেমন প্রচলিত হয়নি। তাছাড়া জীবদেহের অল্প কিছু প্রোটিন থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যেকার পূর্ণাঙ্গ তুলনা করা যায়। ডিএনএ সিকুয়েন্সের বিশ্লেষণে এ অসুবিধাগুলি নেই। আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে এ পরীক্ষণ কার্যক্রম বর্তমানে বেশ সহজলভ্য। ওষুধশিল্প, কৃষি গবেষণা, ফরেনসিক গবেষণায় প্রতিনিয়ত বিভিন্ন জীবের ডিএনএ সিকুয়েন্স বিশ্লেষণ চলছে। ডিএনএ সিকুয়েন্সের তুলনা থেকে জীবজগতে বিভিন্ন প্রজাতির বিবর্তনীয় ইতিহাস বা জীবন বৃক্ষে (Tree of life) তাদের অবস্থান জানা যায়। ডারউইনের প্রস্তাবিত 'জীবন বৃক্ষ' একটি জটিল রেখাচিত্র যার মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রজাতির জীবনের ইতিহাস প্রকাশ করে। গাছের মত অঙ্কিত রেখাচিত্রের একেবারে নীচে রয়েছে সকল জীবের 'সর্বশেষ সর্বজনীন সাধারণ পূর্বসূরি' যাকে ইংরেজিতে বলে last universal common ancestor বা LUCA। অর্থাৎ পৃথিবীতে উদ্ভূত প্রথম জীব। এখান থেকে বিকশিত হয়ে গাছের গুঁড়ি বা কাণ্ড বার বার বিভক্ত হয়ে তৈরি করেছে প্রচুর শাখা-প্রশাখা সমন্বিত বিশাল এক বৃক্ষ। এক একটি শাখা প্রকাশ করে এক একটি প্রজাতি এবং শাখা বিভক্ত হওয়ার বিন্দু হচ্ছে যেখানে এক প্রজাতি থেকে একাধিক প্রজাতি উদ্ভূত হয়েছে। এই রেখাচিত্রের বেশিরভাগ শাখা-প্রশাখা কানাগলিতে হারিয়েছে, ক্ষয় হয়েছে, ঝরে গেছে অর্থাৎ দূর অতীতে যেসব জীবের বর্গ, গোত্র, গণ, প্রজাতিগুলো পৃথিবী থেকে নানা সময়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে বা মারা গেছে। এদের এখন শুধু পাওয়া যায় ফসিল অবস্থায়। আবার কিছু শাখা একদম উপরের দিকে চূড়ার কাছাকাছি রয়েছে, যা নির্দেশ করে বর্তমানে জীবন্ত প্রজাতির। সহজ ভাষায় বলা যায়, জীবন বৃক্ষ হচ্ছে, 'পৃথিবীতে জীবের বিবর্তনের ইতিহাস। পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ উদ্ভূত হওয়ার পর থেকে প্রজাতির বিবর্তন ধারা কোন পথে এগিয়েছে, কিভাবে প্রতিটি প্রজাতি অন্য প্রজাতির সাথে সংশ্লিষ্ট।'[২০] বৃহৎ পরিসরে ডিএনএ গবেষণা থেকে নিশ্চিৎ হওয়া গেছে, দুটি প্রজাতি যত কাছাকাছি (জীবন বৃক্ষে তাদের শাখাদ্বয় যত সাম্প্রতিককালে বিভক্ত হয়েছে), তাদের ডিএনএ, আরএনএ এবং প্রোটিন অণুক্রম বা সিকুয়েন্স তত কাছাকাছি হবে, তত মিল থাকবে। নীচের সারণিটি লক্ষ্য করুন। স্তন্যপায়ী বিভিন্ন প্রাণীর দেহের গ্রৌথ হরমোনের জিন সিকুয়েন্স বিশ্লেষণ করে তাদের মধ্যকার বিবর্তনীয় সম্পর্ক বা জীবন বৃক্ষে কে কতটা কার সাথে নৈকট্যে অবস্থান করছে তার একটি তুলনামূলক চিত্র দেখা যায়[২১] :

	শিম্পাঞ্জি	তিমি	ডলফিন	জলহস্তী	উট	অ্যাল্‌প্যাকা (alpaca)
মানুষ	৯৮	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৮০
শিম্পাঞ্জি		৭৯	৭৯	৭৯	৭৯	৭৯
তিমি			৯৯	৯৭	৯৬	৯৬
ডলফিন				৯৭	৯৬	৯৬
জলহস্তী					৯৫	৯৪
উট						৯৯

উপরের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে, স্তন্যপায়ী প্রাণী তিমি-ডলফিন, উট-অ্যাল্‌প্যাক জোড়ায় নিজেদের মধ্যে ডিএনএ সিকুয়েন্সে শতকরা ৯৯ ভাগ সাদৃশ্য রয়েছে। মানুষ-শিম্পাঞ্জির মধ্যে ডিএনএ সিকুয়েন্সে মিল শতকরা ৯৮ ভাগ। অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে, বিবর্তনীয় জীবন বৃক্ষে (বর্তমানে জীবিত) অন্য যেকোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর তুলনায় মানুষ-শিম্পাঞ্জি পরস্পরের সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করছে। তেমনি তিমি-ডলফিন পরস্পরের সবচেয়ে নিকটে। বলা যায়, প্রাণী জগতে তারা পরস্পরের নিকট আত্মীয়। এরপর তাদের নিকটের স্তন্যপায়ী প্রাণী হচ্ছে জলহস্তী, তিমি-ডলফিনের সাথে যার ডিএনএ সিকুয়েন্সের মিল শতকরা ৯৭ ভাগ। একইভাবে বিবর্তনীয় জীবন বৃক্ষে 'মরুভূমির জাহাজ' বলে খ্যাত উটের সবচেয়ে নিকট আত্মীয় দক্ষিণ আমেরিকার মেষ সদৃশ লোমশ প্রাণী অ্যাল্‌প্যাকা।

গবেষণাগারে ইতিমধ্যে 'প্রাকৃতিক নির্বাচন'কে নানাভাবে প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে, যেমন : 'পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন ওষুধের বিশেষত অ্যান্টিবায়োটিকের যথেচ্ছ ও অনিয়মিত ব্যবহারের ফলে খুব দ্রুত জীবাণুগুলি ওষুধ-প্রতিরোধী হয়ে উঠছে। এক সময় গনেরিয়া নামক যৌনরোগ চিকিৎসায় পেনিসিলিন ওষুধই ব্যবহৃত হত। কিন্তু এ ওষুধের যথেচ্ছ আর অনিয়মিত ব্যবহারের কারণে এখন আর গনেরিয়া রোগ নিরাময়ে পেনিসিলিন ওষুধ কোনো কাজ করতে পারে না। গনেরিয়া রোগের জীবাণু গনোকক্কাস (Gonococcus) ব্যাকটেরিয়া ইতিমধ্যে পেনিসিলিন প্রতিরোধক হয়ে গেছে। ফলে এই রোগের চিকিৎসার জন্য এখন পেনিসিলিন থেকে শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একদম শেষের দিক থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কীটনাশক হিসাবে 'ডিডিটি' (Dichlorodiphenyl Trichloroethane) স্প্রে করা হয়ে আসছে। ১৯৩৯ সালের দিকে সুইজারল্যান্ডের বিজ্ঞানী পল মুলার (Paul Hermann Müller, 1899–1965) কীটনাশক হিসেবে ব্যবহারের জন্য ডিডিটি আবিষ্কার করেন। যার জন্য ১৯৪৮ সালে তিনি মেডিসিন বিভাগে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত হন। আমাদের দেশেও একসময় সরকারিভাবে ম্যালেরিয়া জীবাণু নির্মূলে ক্ষেত-খামারে যথেচ্ছ পরিমাণে ডিডিটি স্প্রে করা হতো। ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ, ম্যালেরিয়া রোগের 'প্লাসমোডিয়াম' এককোষী জীবাণু নির্মূলে মূলত ডিডিটি ব্যবহৃত করা হয়। যদিও ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্লাসমোডিয়ামের বিশাল সংখ্যক সদস্যের বিলুপ্তি ঘটেছে। কিন্তু ডিডিটি'র বিজয় ঘোষিত হয়নি। প্রায় নির্মূল হবার অবস্থার মধ্যে মিউটেশনের ফলে খুব অল্প সময়েই এসব কীটপতঙ্গ, ম্যালেরিয়া জীবাণুর জিনগত কাঠামো বদলে যায়। জিনগত কাঠামো বদলে যাওয়া কীটপতঙ্গ বা জীবাণুরা 'ডিডিটি স্প্রে করা পরিবেশে' প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় টিকে গেছে এবং বংশবিস্তার করেছে। এর ফলে নতুন প্রজন্মের কীটপতঙ্গ-জীবাণু ডিডিটি বা এর বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত কীটনাশক যেমন ম্যালাথিয়ন (Malathion), সংশ্লেষিত পাইরেথ্রয়েড (Synthetic pyrethroids)-প্রতিরোধী হয়ে উঠে। অণুজীববিজ্ঞানীদের কাছে জীবাণুদের এই ধরনের মাল্টি-ড্রাগ প্রতিরোধী হয়ে ওঠা বিশাল সমস্যার ব্যাপার। এতে রোগ নির্মূল পদ্ধতি আরো জটিল হয়ে যায়।[২২] সুইডেনে ডিডিটি ব্যবহারের মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে ১৯৪৬ সালের বাসা-বাড়িতে যেসব মাছি পাওয়া যায় দেখা যায় এরা ডিডিটি-প্রতিরোধী হয়ে গেছে। ১৯৫১ সালের মধ্যে ইটালিতে মশা-মাছি শুধু ডিডিটি-প্রতিরোধী হয়ে যায়নি, নতুন ধরনের কীটনাশক যেমন Chlordane, methoxychlor, heptachlor-প্রতিরোধী হয়ে গেছে। এ ধরনের ঘটনা শুধু ডিডিটি'র ক্ষেত্রে ঘটে নি, কীটনাশক নিয়ে বিভিন্ন গবেষণাতে দেখা গেছে, যথেচ্ছ আর অনিয়মিত ব্যবহারের কারণে জীবাণু-কীটপতঙ্গেরা অনেক সময় মাত্র দুই থেকে আড়াই বছরের মাথায় কীটনাশক প্রতিরোধী হয়ে উঠতে পারে। তবে কীটনাশক-প্রতিরোধী সকল জীবের 'প্রতিরোধ ক্ষমতা' সমান নয়।'[২৩] আমেরিকান কংগ্রেসের ১১০ মিলিয়ন ডলার সহায়তা নিয়ে বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচী ঘোষণা করে জাতিসংঘ ১৯৫৮ সালে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেবে পাঁচ বছরে চার লক্ষ টন ডিডিটি স্প্রে করা হয় সারা বিশ্বে এবং এতে ১৫ থেকে ২৫ মিলিয়ন জীবন রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু ১৯৭২ সালের দিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচিকে 'মৃত' বলে ঘোষণা করে। ইতিমধ্যে এ কর্মসূচির পিছনে এক বিলিয়ন মার্কিন ডলার খরচ হয়ে গিয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে কেন বন্ধ করে দেয়া হল বিশাল এই কর্মসূচিটি। কারণ বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত ম্যালেরিয়া জীবাণুর বিরুদ্ধে খুব ধীর গতিতে এই কর্মসূচিটি পরিচালিত হচ্ছিল। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত অঞ্চলগুলোতে একসাথে এ কর্মসূচি শুরু করা যায় নি সরকারি নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে। কর্মসূচি চলাকালে গবেষকরা দেখতে পাচ্ছিলেন ধীরগতিতে পরিচালিত কর্মসূচি তুলনায় মশা বা প্লাসমোডিয়াম জীবাণুর বিবর্তন প্রক্রিয়া দ্রুত গতিতে হচ্ছিল। এভাবে চলতে থাকলে ডিডিটি-'প্রতিরোধ ক্ষমতা' সম্পন্ন মশা বা প্লাসমোডিয়ামকে কখনও নির্মূল করা যাবে না। শুধু অর্থেরই অপচয় হবে। এছাড়া ডিডিটি' বিরুদ্ধে মারাত্মক আরেকটি অভিযোগ হচ্ছে এটির যথেচ্ছ ব্যবহারে পরিবেশের জন্য বিপর্যয় ঢেকে আনে। ক্ষেতখামারে ডিডিটি স্প্রে করা হলে বৃষ্টির পানিতে এটি ধুয়ে নদীর পানিতে গিয়ে মেশে। অথবা স্থানীয় জলাশয়ে গিয়ে পড়ে। ডিডিটি'র রাসায়নিক প্রভাবের কারণে যেমন মাছের অকাল মৃত্যু ঘটে, তেমনি এই পানি পান করে ঈগল, কাক জাতীয় পাখির প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। গৃহপালিত পশুও মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এতে প্রকৃতির স্বাভাবিক খাদ্যচক্র এতে বাধাগ্রস্থ হয়। আমেকিার সামুদ্রিক জীববিজ্ঞানী রাসেল কারসন (Rachel Louise Carson, 1907–1964) ১৯৬২ সালে প্রকাশিত তার *Silent Spring* বইয়ে ডিডিটি'র যথেচ্ছ ব্যবহারে আমাদের ইকোসিস্টেম যে কিভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সে বিষয়টি খুব স্পষ্ট করে জনসচেতনতার মধ্যে নিয়ে আসেন। অবশ্য প্রথম দিকে জাতিসংঘ ঘোষিত ম্যালেরিয়া নির্মূল কর্মসূচিতে ডিডিটি ব্যবহারে সফলতার হার খুব বেশিই ছিল। যেমন শ্রীলঙ্কায় ১৯৫৫ সালে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল দশ লক্ষেরও অধিক। ডিডিটি ব্যবহারে ১৯৬১ সালের হিসেবে ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়ায় মাত্র দুই ডজনেরও কম। এই সফলতা অবশ্য

পরবর্তীতে ধরে রাখা যায় নি। ঐ বছরের গবেষণায় দেখা গেছে শ্রীলঙ্কাতে মশা এবং ম্যালেরিয়া রোগের এককোষী জীবাণু প্লাসমোডিয়ামের নতুন প্রজন্মগুলি প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় ডিডিটি এবং নতুন ধরনের ড্রাগ যেমন 'ক্লোরোকুইন' প্রতিরোধী হয়ে বিবর্তিত হয়ে গেছে। (দ্রষ্টব্য : Stephen R. Palumbi, 135-138)।

আমেরিকার মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ের Microbial Ecology বিভাগের অধ্যাপক রিচার্ড লেনস্কি (Richard Lenski) প্রাকৃতিক নির্বাচন নিয়ে সবচেয়ে দীর্ঘসময় ব্যাপী গবেষণা কার্যক্রম চালিয়েছেন। ১৯৮৮ সালে রিচার্ড লেনস্কি *E. coli* (*Escherichia coli*) ব্যাকটেরিয়া নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত ই. কোলাই ব্যাকটেরিয়ার পঞ্চাশ হাজার প্রজন্মের উপর মিউটেশন, ভ্যারিয়েশন, নতুন পরিবেশের সাথে অভিযোজন, বেঁচে থাকার লড়াই, নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বকে ল্যাবরেটরিতে প্রমাণ করেছেন।[২৪] ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের তরুণ অধ্যাপক এবং বর্তমানে নিউজিল্যান্ডের মাসেই বিশ্ববিদ্যালয়ের (Massey University) কর্মরত অধ্যাপক পল রেনি (Paul Rainey) এবং তার সহযোগীরা গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া *pseudomonas fluorescens* নিয়ে গবেষণা কাজ চালিয়েছেন।[২৫] এই ব্যাকটেরিয়াটি মানুষের শরীরে তেমন কোনো রোগ সৃষ্টির কারণ নয় তবে মাঝে মাঝে অসুস্থ রোগীর রোগ-প্রতিরোধ ব্যবস্থায় আক্রমণ করে থাকে (যেমন ক্যান্সার আক্রান্ত চিকিৎসাধীন রোগী)। তবে এই ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে এর কারণে গরমকালে দুধ নষ্ট হয়ে তিক্তস্বাদের হয়ে ওঠে, পনির ভেঙ্গে যায় ইত্যাদি। পল রেনি গবেষণাগারের ফ্লাস্কের মধ্যে মুক্ত-ভাসমান এবং মসৃণ ধরনের *pseudomonas fluorescens* ব্যাকটেরিয়া সংগ্রহ করে কালচার করতে লাগলেন। ফ্লাস্কে ব্যাকটেরিয়ার জন্য পূর্বে পুষ্টিকর খাদ্য মজুদ ছিল। গবেষকদল এই ফ্লাস্কের কয়েক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করলেন। মানে ফ্লাস্কের উপরের দিকে সবচেয়ে বেশি পরিমাণ অক্সিজেন কেন্দ্রীভূত করলেন এবং ফ্লাস্কের তলানীর দিকে একদম কম পরিমাণ অক্সিজেন কেন্দ্রীভূত করলেন। এ অবস্থায় *pseudomonas fluorescens* ব্যাকটেরিয়ার কালচার চলতে লাগল। মাত্র দশদিনের মাথায় ফ্লাস্কের কৃত্রিম পরিবেশে *pseudomonas fluorescens* ব্যাকটেরিয়ার কয়েক শ' প্রজন্ম সৃষ্টি হয়। পল রেইনে লক্ষ্য করলেন ফ্লাস্কের মধ্যে পরিবেশের ভিন্নতার কারণে (অক্সিজেনের ভিন্নতা) মুক্ত-ভাসমান এবং মসৃণ *pseudomonas fluorescens* আদি ব্যাকটেরিয়া হতে দুটি ভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া বিবর্তিত হয়েছে। এক ধরনের ব্যাকটেরিয়াগুলি ফ্লাস্কের ভিতর যে তরল পদার্থ ছিল (ব্যাকটেরিয়া কালচার করার জন্য) তার উপর দিকে 'ভাঁজ (কুঞ্চিত) হয়ে ছড়িয়ে' (wrinkly spreader) ঘনস্তর সৃষ্টি করেছিল। ফ্লাস্কের তলানীর দিকে আরেক ধরনের ব্যাকটেরিয়াগুলি আঁশের মতো (fuzzy) ঝাপসা ঘোলাটে হয়ে কার্পেটের মতো বিস্তৃত ছিল। আর ফ্লাস্কের তরল পরিবেশের মাঝামাঝি অংশে সেই মুক্ত-ভাসমান এবং মসৃণ *pseudomonas fluorescens* পূর্বসূরি ব্যাকটেরিয়ার মত একই বৈশিষ্ট্যের ব্যাকটেরিয়ারগুলি অবস্থান করছিল। গবেষকদল ফ্লাস্কের আলাদা আলাদা স্তর থেকে ব্যাকটেরিয়াগুলির নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখলেন নতুন দুই ধরনের ব্যাকটেরিয়ারা মুক্ত-ভাসমান এবং মসৃণ *pseudomonas fluorescens* আদি ব্যাকটেরিয়ার হতে জিনগতভাবে পৃথক হয়ে গেছে। অর্থাৎ ফ্লাস্কের মধ্যে ইতিমধ্যে *pseudomonas fluorescens* ব্যাকটেরিয়ার নতুন দুটি প্রজাতি সৃষ্টি হয়েছে। ফ্লাস্কের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে অক্সিজেন সরবরাহে পার্থক্য সৃষ্টি করায় *pseudomonas fluorescens* ব্যাকটেরিয়াগুলির মধ্যে এত দ্রুত মিউটেশন ঘটেছে এবং প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ নতুন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়া সৃষ্টি হয়েছে যা পল রেনির নেতৃত্বাধীন গবেষক দলের কাছে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। এতো স্বল্প সময়ের মধ্যে প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় *pseudomonas fluorescens* ব্যাকটেরিয়ার পরিবর্তিত পরিবেশের সাথে অভিযোজন এবং একই সাথে ব্যাকটেরিয়ার ছোট মাত্রায় 'adaptive radiation' উৎপন্ন হয়েছে। মানে *pseudomonas fluorescens* ব্যাকটেরিয়ার নতুন দুটি প্রজাতি গঠন (speciation) গবেষণাগারে বিজ্ঞানীরা তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি জৈববিবর্তন জীবজগতের অবশ্যই এক ধরনের বাস্তবতা আর সেই বাস্তবতাকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সুষ্ঠুভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব'।

এরপরও অভিযোগ ওঠে '*প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় জৈববিবর্তন এমন একটি তত্ত্ব, যাকে মিথ্যাপ্রতিপন্ন (falsify) করার কোনো সুযোগ নেই।*' অভিযোগটি মোটেও সত্য নয়। এ তত্ত্বটি মোটেও অবাস্তব-কল্পিত কোনো বক্তব্য বা ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেনি যে একে মিথ্যাপ্রতিপন্ন করার সুযোগ থাকবে না। জৈববিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হচ্ছে জিনেটিক মিউটেশন। যার ফলে প্রজাতিতে বংশ পরম্পরায় ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব হয়। এখন কেউ যদি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারেন জীবদেহের জননকোষে মিউটেশন ঘটে না কিংবা জননকোষে মিউটেশন ঘটে কিন্তু ঐ জীবের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে তা প্রবাহিত হয় না, কিংবা প্রবাহিত হলেও বংশধরদের মধ্যে কোনো ভ্যারিয়েশনের উদ্ভব হয় না, কিংবা পরিবর্তিত পরিবেশের পক্ষে উপযুক্ত ভ্যারিয়েশনসম্পন্ন জীব অভিযোজন ঘটাতে পারে না—তাহলে জৈববিবর্তনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বটি 'মিথ্যা' প্রমাণিত হয়ে যায়! কিন্তু তেমন কিছু এখনো হাজির হয় নি।

জৈববিবর্তনের পক্ষে প্রচুর গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগৃহীত হয়েছে ফসিলবিদ্যা বা প্রত্নজীববিদ্যা থেকে। এখন পর্যন্ত এমন একটি ফসিলও পাওয়া যায় নি, যা জৈববিবর্তনের 'জীবন বৃক্ষের' (tree of life) বিরোধী কিংবা ভূতাত্ত্বিক সময়কালের সাথে খাপ খায় না। যদি এমন কোন ফসিল উপস্থাপন করা যায়, যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা (শারীরসংস্থান পরীক্ষা, ডিএনএ টেস্ট, রেডিওঅ্যাক্টিভ ডেটিং ইত্যাদি) দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব হয় যে উক্ত ফসিল জৈববিবর্তনের জীবন বৃক্ষ, ভূতাত্ত্বিক সময়কালের সাথে সাংঘর্ষিক, তাহলে জৈববিবর্তন তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু এখনও তেমন কোনো ফসিল পাওয়া যায় নি।

ইংল্যান্ডের খ্যাতিমান জীববিজ্ঞানী এবং বংশগতিবিদ জে. বি. এস. হ্যালডেনকে (১৮৯২-১৯৬৪) একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'জৈববিবর্তন তত্ত্বকে কিভাবে মিথ্যা প্রমাণ করা সম্ভব?' উত্তরে হ্যালডেন জানিয়েছিলেন[২৬]—'*কেউ যদি প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান পিরিয়ডের শিলাখণ্ডে একটি খরগোশের ফসিল আবিষ্কার করতে পারে, তবে জৈববিবর্তন তত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যাবে।*' কারণ জৈববিবর্তনের ফসিল রেকর্ড অনুসারে প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান সময়ে (৪৫০০ থেকে ৫৪৩ মিলিয়ন বছর পূর্বে) শুধু সায়ানোব্যাকটেরিয়া[২৭], ব্যাকটেরিয়া, আরকিয়ান জাতীয় আদিম জীবের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানকালের মেরুদণ্ডী প্রাণী, উভচর, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী প্রাণীর কোনো অস্তিত্ব ছিল না। খরগোশ সম্পূর্ণ আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণী। আদিম স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব হয়েছে ট্রায়াসিক পিরিয়ডের (২৪৮ থেকে ২০৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে) কোনো এক সময়। সহজভাবে বলতে গেলে জৈববিবর্তনের ধারা অনুসারে এক কোষী জীব থেকে বহুকোষী জীবের উদ্ভব, এরপর আদিম অমেরুদণ্ডী প্রাণী থেকে আদিম মেরুদণ্ডী প্রাণী; সামুদ্রিক প্রাণী মাছ থেকে চতুষ্পদী উভচর প্রাণী। উভচর প্রাণী থেকে সরীসৃপ এবং সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী থেকে পাখি এবং স্তন্যপায়ী জাতীয় প্রাণীর উদ্ভব। তাই প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শিলাখণ্ডে খরগোশ কিংবা অন্য কোনো স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল পাওয়া গেলে এক মুহূর্তেই জৈববিবর্তন তত্ত্বকে মিথ্যা প্রমাণ করে দিবে।

জার্মান জীববিজ্ঞানী আর্নেস্ট মায়ার (১৯০৪-২০০৫) অবশ্য আরো সহজ করে বলেছেন : 'সকল আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণী ১০০ থেকে ২০০ মিলিয়ন বছরের বেশি পুরাতন নয়। ১০০ থেকে ২০০ মিলিয়ন বছরের পুরাতন শিলাখণ্ডের মধ্যেই এদের (আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর) ফসিল খুঁজে পাওয়া যায়। এ সময়কালের অধিক পুরাতন কোনো শিলাখণ্ডে আধুনিক স্তন্যপায়ী প্রাণীর ফসিল পাওয়া যায় না। স্তন্যপায়ী প্রাণী জিরাফের উদ্ভব ঘটেছে প্রায় তিন কোটি (৩০ মিলিয়ন) বছর আগে মধ্য-টারশিয়ারি সময়কালে। এখন যদি কখনো ছয় কোটি বছর (৬০ মিলিয়ন) পূর্বে প্যালিয়োসিন সময়কালের শিলাখণ্ডে কোনো জিরাফের ফসিল পাওয়া যায়, তাহলে তাও জৈববিবর্তন তত্ত্বকে নস্যাৎ করে দিবে।'[২৮]

এরপরও কথা থাকে। *'বিজ্ঞান তো নিয়ত পরিবর্তনশীল; তার তত্ত্বগুলোও অনেক সময় পরিবর্তন হয়ে যায়। তাহলে তত্ত্বের মূল্য থাকে কই?'* অবশ্যই বিজ্ঞান স্থির কোনো কিছু নয়; স্থবির নয়। প্রতিনিয়তই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তত্ত্বগুলো তৈরি হয়, পূর্বের তত্ত্বগুলো ঝাচাই হয়, পরিবর্তিত-পরিবর্ধিত-সংস্কার হয়। একটা উদাহরণ দিই : নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীর একটি ফ্যাক্ট বা বাস্তবতা 'মাধ্যাকর্ষণ শক্তি'কে ব্যাখ্যা করতে পারি। কিন্তু ২৫০ বছর পরে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর 'সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে'র মাধ্যমে দেখালেন, নিউটনের থিওরি কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক ফল দেয় না; যেমন যে সমস্ত জায়গায় মাধ্যাকর্ষণ বলের প্রভাব বেশি (যেমন ব্ল্যাকহোল), সে সমস্ত জায়গায় আলোর গতিপথ বেঁকে যায়। ১৯১৯ সালে ২৯ মে সূর্য গ্রহণের সময় জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্যার ফ্র্যাঙ্ক ডাইসন আইনস্টাইনের (১৯১৫ সালে প্রদত্ত) সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বটি প্রমাণ করেন। যেহেতু 'বিশেষ পরিস্থিতিতে নিউটনের থিওরি অব গ্র্যাভিটি'র সীমাবদ্ধতা' আবিস্কৃত হয়েছে, তবে কি পৃথিবীতে অভিকর্ষ বলের বাস্তবতা বাতিল হয়ে গেছে? অর্থাৎ গাছ থেকে ফল এখন মাটিতে পড়ে না, শূন্যে ভেসে থাকে, উপরের দিকে ঢিল ছুঁড়লে সেটা মাটিতে নেমে আসে না, সেটাও শূন্যে রয়ে যায়? মোটেও না। বাস্তবতা থিওরির উপর নির্ভরশীল হয়ে বসে নেই। আবার নিউটনের অভিকর্ষ তত্ত্ব এখনও (বিশেষ পরিস্থিতি বাদে) যথেষ্ট পরিমাণে অভিকর্ষ বলকে ব্যাখ্যা করতে পারে।

বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে অনুকল্পটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা-বিশ্লেষণের পর বাস্তবতাকে সবচেয়ে ভালোভাবে এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারে, তাকেই 'তত্ত্ব' হিসেবে গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে যদি দেখা যায়, বর্তমানে প্রচলিত তত্ত্বের চেয়ে আরো ভালো ব্যাখ্যা অন্য কোনো অনুকল্পকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পাওয়া যাচ্ছে, তখন বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ীই নতুন এই অনুকল্পকে 'তত্ত্ব' হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এটা বিজ্ঞানের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, অত্যাবশ্যকীয় বৈজ্ঞানিক নীতিমালা। এভাবেই নতুন-উন্নততর তত্ত্বের মাধ্যমে বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করে বিজ্ঞানের অগ্রগামিতা রচিত হয়। প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বও এর ব্যতিক্রম নয়। ভবিষ্যতে যদি কখনো দেখা যায়, নতুন কোনো অনুকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব থেকেও আরো ভালোভাবে

বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড বজায় রেখে জীবজগতের বিভিন্ন বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করতে পারছে, তখন নির্দ্বিধায় নতুন অনুকল্পটিকে 'তত্ত্ব' হিসেবে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে যেহেতু প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্বের বাইরে আর একটিও বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নেই যা জীবজগতের বাস্তবতাগুলিকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় ব্যাখ্যা করতে পারে, বিধায় এ তত্ত্বকে গ্রহণের কোনো বিকল্পও নেই।

আগ্রহী পাঠকের সুবিধার্থে নিচে জৈববিবর্তন সম্পর্কে আমেরিকার প্রত্নজীববিদদের সংগঠন 'প্যালিওন্টোলজিক্যাল সোসাইটি'র বক্তব্য তুলে ধরা হল[২৯] :

The Paleontological Society Position Statement: Evolution

> Evolution is both a scientific fact and a scientific theory. Evolution is a fact in the sense that life has changed through time. In nature today, the characteristics of species are changing, and new species are arising. The fossil record is the primary factual evidence for evolution in times past, and evolution is well documented by further evidence from other scientific disciplines, including comparative anatomy, biogeography, genetics, molecular biology, and studies of viral and bacterial diseases. Evolution is also a theory – an explanation for the observed changes in life through Earth history that has been tested numerous times and repeatedly confirmed. Evolution is an elegant theory that explains the history of life through geologic time; the diversity of living organisms, including their genetic, molecular, and physical similarities and differences; and the geographic distribution of organisms. Evolutionary principles are the foundation of all basic and applied biology and paleontology, from biodiversity studies to studies on the control of emerging diseases.
>
> Because evolution is fundamental to understanding both living and extinct organisms, it must be taught in public school science classes. In contrast, creationism is religion rather than science, as ruled by the Supreme Court, because it invokes supernatural explanations that cannot be tested. Consequently, creationism in any form (including "scientific creationism," "creation science," and "intelligent design") must be excluded from public school science classes. Because science involves testing hypotheses, scientific explanations are restricted to natural causes.
>
> This difference between science and religion does not mean that the two fields are incompatible. Many scientists who study evolution are religious, and many religious denominations have issued statements supporting evolution. Science and religion address different questions and employ different ways of knowing.
>
> The evolution paradigm has withstood nearly 150 years of scrutiny. Although the existence of evolution has been confirmed many times, as a science evolutionary theory must continue to be open to testing. At this time, however, more fruitful inquiries address the tempo and mode of evolution, various processes involved in evolution, and driving factors for evolution. Through such inquiry, the unifying theory of evolution will become an even more powerful explanation for the history of life on Earth.

উৎস নির্দেশ এবং টীকা :

১. বিজ্ঞানের কর্ম-প্রক্রিয়া জানতে এই ওয়েব সাইটটি দেখুন : Understanding Science: how science really works, http://undsci.berkeley.edu/article/howscienceworks_01

২. Michael Shermer, *Why Darwin Matters*, New York, Henry Holt and Company, LLC, 2007, pp. 93-99

৩. চার্লস রবার্ট ডারউইন, *প্রজাতির উৎপত্তি*, (ভাষান্তর ম. আখতারুজ্জামান), ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ বিশ-একুশ (অনুবাদকের কথা)

৪. http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/0_0_0/evo_25

৫. http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=agricultures-sustainable-future

৬. দ্বিজেন শর্মা, *চার্লস ডারউইন ও প্রজাতির উৎপত্তি*, ঢাকা, সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭, পৃ ২৪-২৫

৭. Peter Savolainen et al., Genetic Evidence for an East Asian Origin of Domestic Dogs, *Science*, 22 November 2002, Vol. 298, no. 5598, pp. 1610-1613
৮. Mark Pallen, *The Rough Guide to Evolution*, USA, Rough Guides Ltd, 2009, pp. 202-203
৯. Charles Darwin, *The Origin of Speicies*, Delhi, W. R. Goyal Publishers, 2006, pp. 90, 109
১০. সার্ন এবং এলএইচসি প্রকল্প সম্পর্কে জানতে দেখুন : http://public.web.cern.ch/public/Welcome.html এবং http://en.wikipedia.org/wiki/Large_Hadron_Collider
১১. Edward J. Larson, *Evolution: The Remarkable History of a Scientific Theory*, New York, Modern Library, 2006, p. 62
১২. http://www.avert.org/worldstats.htm
১৩. Stephen R. Palumbi, *The Evolution Explosion: How Humans Cause Rapid Evolutionary Change*, New York, W.W. Norton & Company, 2002, pp. 95-130
১৪. টীকা : চারটি গণের ১৩ প্রজাতির ফিঞ্চ পাখি হল : *Geospiza magnirostris, G. fortis, G. fuliginosa, G. nebulosa* (পূর্বে *difficilis*), *G. scandens, G. conirostris, Platyspiza crassirostris, Camarhynchus psittacula, C. pauper, C. parvulus, C. pallidus, C. heliobates, Certhidea olivacea* । পরবর্তীতে বাকি একটি প্রজাতি (*Pinaroloxias inornata*) পাওয়া গিয়েছে উত্তর-পূর্ব দিকের চারশ মাইল দূরের কোকস (Cocos) দ্বীপ হতে । এটি ডারউইন দেখতে পাননি এবং সংগ্রহও করেননি ।
১৫. বিভিন্ন প্রজাতির ফিঞ্চ পাখি সম্পর্কে জানতে দেখুন : Frank Sulloway, Darwin's Finches: Evolution of a Legend, *Journal of the History of Biology*, 15, 1982, Available at www.sulloway.org/Finches.pdf
১৬. Peter R. Grant & B. Rosemary Grant, *How and Why Species Multiply: The Radiation of Darwin's Finches*, Princeton University Press, 2007 এবং Jonathan Weiner, *The Beak of the Finch: A Story of Evolution in Our Time*, Vintage, 1995.
১৭. Sean B. Carroll, *The Making of the Fittest: DNA and the ultimate forensic record of evolution*, London, Quercus, 2009, pp. 59-60, 222-225
১৮. Sean B. Carroll, *Endless Forms Most Beautiful: The New Science of Evo Devo*, New York, W. W. Norton, 2005, P. 102
১৯. Eva Jablonka and Marion J. Lamb, *Evolution in Four Dimensions*, England, MIT Press, 2006, pp. 11-12
২০. জীবন বৃক্ষ নিয়ে সাম্প্রতিককালের বিজ্ঞানীদের ধারণা এবং এ বিষয়ে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে দেখুন (আমেরিকার ন্যাশনাল সায়েন্স ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ইলেকট্রনিক পাম্পলেট) : www.ucjeps.berkeley.edu/tol.pdf
২১. Daniel J. Fairbanks, *Relics of Eden: The Powerful Evidence of Evolution in Human DNA*, New York, Prometheus Books, 2010, p. 126
২২. Stuart B. Levy, *The Antibiotic Paradox: How the Misuse of Antibiotics Destroys Their Curative Powers*, 2nd ed. USA, Perseus Publishing, 2002, p. 112
২৩. ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, *বংশগতি ও জিনের অসুখ*, কলকাতা, পাভলভ ইনস্টিউট, ২০০১, পৃ ৪৪-৪৫
২৪. টীকা : প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়া প্রজাতিগুলোর এক প্রজন্মকাল খুব কম করে হলে মাত্র ১৫ মিনিট আর খুব বেশি হলে দিন কয়েক পর্যন্ত হয়ে থাকে । মানুষের এক প্রজন্মকাল ২৫ বছর । প্রাকৃতিক পরিবেশে *ঊ. ঈড়ষর* নামক ব্যাকটেরিয়ার এক প্রজন্মকাল ৬০ মিনিট কিন্তু গবেষণাগারের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ই. কোলাইয়ের চাষের সময় বাহির থেকে খাদ্য সরবরাহ করলে এর প্রজন্মকাল মাত্র ১৫-২০ মিনিট পর্যন্ত হয়ে থাকে ।
২৫. http://evolution.massey.ac.nz/rainey/index.htm
২৬. Richard Dawkins, *The God Delusion*, Bantam Press, 2006, p. 128
২৭. টীকা : পূর্বে এদের ভুলভাবে 'নীলাভ-সবুজ শৈবাল' বলে ডাকা হত । কিন্তু 'সায়ানেব্যাকটেরিয়া' সত্যিকার অর্থে শৈবাল জাতীয় জীব নয় । দেখতেও নীল-সবুজ রঙের নয় । সাধারণত এরা দেখতে লাল বা বাদামি রঙের হয়ে থাকে । বেশিরভাগ শৈবাল ইউক্যারিয়টকোষী জীব আর সায়ানেব্যাকটেরিয়া প্রোক্যারিয়টকোষী জীব । পৃথিবীর সবচেয়ে আদিম জীব সায়ানেব্যাকটেরিয়া সাধারণত এককোষী হলেও (বেশিরভাগ শৈবাল বহুকোষী) এদেরকে কলোনির আকারে কাপের্টের মত বিস্তৃত হয়ে কিংবা সূতার মত গঠনে সমুদ্রের তলদেশে, মাটিতে, শিলাখণ্ডে, মরভূমিতে এমন কী চরম বিরূপ পরিবেশে পাওয়া যায় ।
২৮. Ernst Mayr, *What Evolution is*, Orion Publishing Group, 2002, p. 20
২৯. The Paleontological Society, USA, Web site: http://www.paleosoc.org/evolutioncomplete.htm

অতিরিক্ত পাঠ :

১. Evolution is a Fact and a Theory, Laurence Moran, The Talk Origin Archive, http://www.talkorigins.org/faqs/evolution-fact.html
২. T. Ryan Gregory, *Evolution as Fact, Theory*, and Path, http://www.gregorylab.org/reprints/FactTheoryPath.pdf
৩. Carl Zimmer, *A New Step In Evolution*, http://scienceblogs.com/loom/2008/06/02/a_new_step_in_evolution.php
৪. Richard Lenski Experimental Evolution, http://myxo.css.msu.edu/ecoli/